সংক্ষেপে হেযবুত তওহীদ

মানবতার কল্যাণে নিবেদিত অরাজনৈতিক আন্দোলন

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সংক্ষেপে হেযবুত তওহীদ

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সংক্ষেপে হেযবুত তওহীদ

লেখক: হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

সম্পাদনাঃ মো. রিয়াদুল হাসান

সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

প্রকাশক: তওহীদ প্রকাশন

তওহীদ প্রকাশন

১৩৯/১ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও-১২১৫

ফোন: ০১৬৮৬৪৬২১৭৫, ০১৭১১০০৫০২৫

hezbuttawheed1995@gmail.com

www.hezbuttawheed.org

www.hezbuttawheed.com

প্রথম প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ: মো. জোবায়ের হাসান

অলঙ্করণ: হেলাল উদ্দিন

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৫
তওহীদ: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব..........৬
আকিদা ভুল হলে ঈমান ও আমল অর্থহীন.......... ৭
মহানবীর (সা.) আগমনের উদ্দেশ্য ৯
দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি.......... ১০
দীন ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি..........১১
উম্মাহ সৃষ্টি ১২
আরবের কী পরিবর্তন হয়েছিল ১৩
মো'মেন মুসলিম বনাম কাফের মোশরেক ১৪
শরিয়াহ ও মারেফত ১৬
সালাহ: মো'মেনের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ..........১৮
হজ: মুসলিম উম্মাহর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মহাসম্মেলন ১৯
দীনের বিনিময় কেন নেওয়া যাবে না..........২০
নারীদের অংশগ্রহণ.......... ২১
সঙ্গীত ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ২২
ক্রীড়া..........২৪
সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা ২৫
দাজ্জাল: ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা' ! ২৭
দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের মৃত্যু হচ্ছে না ২৮
মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা ৩০
মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ৩২
হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠা..........৩৪
চেইন অব কমান্ড: বর্তমান এমাম ৩৫
যোগদানের শর্তাবলি ও আন্দোলনের নীতিমালা.......... ৩৬
পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার ৩৭
আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত ৩৮
হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কারা করে, কেন করে?..........৩৯
জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস..........৪১
প্রতিষ্ঠাতা এমামের পরিচয়..........৪৩
বিশেষ অর্জন (Achievements)..........৪৪
হেযবুত তওহীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড..........৪৫
তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ৪৮

আমাদের অন্যান্য বইসমূহ

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ্
৩. The Lost Islam
৪. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
৫. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'! (বাংলা ও ইংরেজি)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)
৯. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
১০. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভাষণ
১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে
১৫. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
১৬. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
১৭. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
১৮. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
১৯. ধর্মব্যবসার ফাঁদে
২০. হলি আর্টিজানের পর...
২১. সওমের উদ্দেশ্য
২২. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা
২৩. আক্রান্ত দেশ আক্রান্ত ইসলাম
২৪. সম্মানিত আলেমদের প্রতি
২৫. তওহীদ জান্নাতের চাবি
২৬. শোষণের হাতিয়ার (DIVIDE & RULE -শোষণের হাতিয়ার)
২৭. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়
২৮. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
২৯. পন্নী পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস
৩০. জঙ্গিবাদ সঙ্কট: উত্তরণের একমাত্র পথ
৩১. পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা
৩২. শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্যবাদ ও প্রকৃত ইসলাম
৩৩. হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এই অসীম সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, নিশ্চয়ই এর কোনো মহান উদ্দেশ্য রয়েছে (সুরা দুখান ৩৮)। 'কুন্' শব্দ উচ্চারণ করে তিনি এই সমগ্র সৃষ্টি করেছেন (সুরা নাহল ৪০)। তিনি বলেছেন আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুকেই তিনি মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন (সুরা জাসিয়া ১৩)। তাহলে মানুষের জীবন কি উদ্দেশ্যহীন হতে পারে? অবশ্যই নয়। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য না জানা থাকলে বা ভুল জানলে মানুষ তার মূল্যবান জীবনের সঠিক ব্যবহার করতে পারবে না। কী সেই উদ্দেশ্য?

আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন তখনই তিনি অগণিত মালায়েকের সামনে এই নতুন সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা সৃষ্টি করতে চাই।' (সুরা বাকারা ৩০)। কাজেই পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফা। খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য, তার মুখ্য এবাদত যে এবাদত করার জন্যই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সুরা যারিয়াত ৫৬)। আল্লাহ যখন সকল মালায়েককে ডেকে তাঁর এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন সকল মালায়েক একবাক্যে বলল, 'আপনি কি এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যারা পৃথিবীতে গিয়ে অন্যায় অবিচার ও রক্তপাত ঘটাবে?' (সুরা বাকারা ৩০)।

আল্লাহ তাদের সামনে আদমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে সবাইকে বললেন যেন আদমকে সেজদা করে এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়। একমাত্র ইবলিস অহংকার করল। সে মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করল। সে ছিল আগুনের তৈরি, তাই স্বভাবগতভাবেই অহংকারী। সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করল যে তাকে যদি অবকাশ দেওয়া হয় তাহলে সে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবে যে মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়। সে আল্লাহ দেখানো পথে থাকবে না, সেও আল্লাহর অবাধ্য হবে এবং অন্যায়-অবিচার ও রক্তপাতে লিপ্ত হবে। মানুষ যেন কোনোভাবেই আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে না পারে, সেজন্য প্রতিনিয়ত মানুষেকে কু-প্ররোচনা দিয়ে যাবে ইবলিস। আল্লাহ আদম ও হাওয়াকে (আ.) জান্নাতের সকল নেয়ামত উপভোগ করার স্বাধীনতা দিলেন এবং একটি মাত্র নিষেধাজ্ঞা দিলেন যে, ঐ বৃক্ষের কাছে যাবে না। কিন্তু শয়তান তাঁদেরকে প্ররোচনা দিয়ে আল্লাহর সেই নিষেধ অমান্য করালো। আল্লাহ তখন আদম-হাওয়া ও ইবলিসকে পরস্পরের শত্রু হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ আদমকে বললেন যে তিনি সেখানে হেদায়াত বা পথনির্দেশ পাঠাবেন (সুরা বাকারা ৩৮)। মানুষ যদি সেই পথনির্দেশ অনুসরণ করে তাহলে তার কোনো ভয় নেই। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার, রক্তপাতের মধ্যে না পড়ে ন্যায় ও শান্তিতে বাস করবে এবং পরকালে আবার তার আসল ঠিকানা জান্নাতে ফিরে আসবে। সে যদি ইবলিসের সঙ্গে কৃত চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে বিজয়ী করতে পারে তাহলে অনন্ত পুরস্কার লাভ করবে।

তওহীদ: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

পৃথিবীতে এখন মানুষের সামনে দুটি পথ। একদিকে নবী-রসুলদের মাধ্যমে আল্লাহর পাঠানো হেদায়াহ সহজ সরল পথ (সেরাতুল মুস্তাকিম) এবং অপরদিকে ইবলিসের দেখানো বক্র পথ, ভুল পথ। অর্থাৎ হয় মানুষ আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থা দিয়ে জীবন পরিচালনা করবে। অথবা সে শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নিজেই নিজের জন্য জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নেবে। আর সেটাই হল ইবলিসের পথ, দলালাহ। এর ফল হবে অশান্তি, অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত যার কথা ইবলিসসহ সকল মালায়েক বলেছিল। এজন্য শান্তি পেতে হলে শুরুতেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে প্রথমে। এটাই হচ্ছে দীনের ভিত্তি তওহীদ যা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-র মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। এই তওহীদের ঘোষণা দিয়েই একজন মানুষকে ইসলামে দাখিল হতে হয়। এই তওহীদ হচ্ছে জান্নাতের চাবি (হাদিস- মু'আজ বিন জাবাল থেকে আহমদ)। সকল নবী-রসুল এই তওহীদ নিয়ে এসেছেন (সুরা আম্বিয়া ২১)। শেষ নবীর উম্মত হিসাবে আমাদের কলেমা হল - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.)- অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া আর কারো হুকুম বিধান মানি না আর মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল। এর তাৎপর্য হচ্ছে- জীবনের সর্ব অঙ্গনে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর কোনো কথা আছে সে বিষয়ে আর কারো কোনো হুকুম, বিধান মানা যাবে না।

বর্তমানে 'ইলাহ' শব্দের অর্থ করা হয় 'উপাস্য' যার আরবি হচ্ছে 'মাবুদ'। কিন্তু ইলাহ ও মাবুদ এই দুটো শব্দের অর্থ ভিন্ন। ইলাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- তিনি সেই সত্তা যার আনুগত্য করতে হবে অর্থাৎ যিনি হুকুমদাতা, বিধানদাতা, সার্বভৌমত্বের মালিক। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য/মাবুদ নেই' কলেমার এই অর্থ করলে তওহীদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না। কাজেই কলেমা প্রকৃত অর্থ হবে- আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই। ইলাহ শব্দের অর্থ ভুল করার কারণে আমরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহকে মাবুদ বা উপাস্য মেনে নামাজ, রোজা, হজসহ বিভিন্ন আমল করে যাচ্ছি। লক্ষ লক্ষ মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে আল্লাহর উপাসনার জন্য। কিন্তু সমাজে শান্তি আসছে না। কারণ শান্তির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম-বিধান মান্য করা। অথচ আমাদের সামষ্টিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমরা মানছি মানুষের তৈরি বিধান অর্থাৎ ইবলিসের হুকুম। এর পরিণামই হচ্ছে বিশ্বজুড়ে চলমান অন্যায়, অবিচার ও রক্তপাত। এই অশান্ত পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর দেখানো সেই হেদায়াহ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নেওয়া। তাহলেই মানুষ পৃথিবীতে সুখে বাস করবে, পরকালে জান্নাতে ফিরে যাবে।

আকিদা ভুল হলে ঈমান ও আমল অর্থহীন

এই দীনের সমস্ত আলেম ও ফকিহদের অভিমত হচ্ছে এই যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। নামায, রোযা, হজ, যাকাত, ইত্যাদিসহ আরও হাজারো রকমের আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান; আল্লাহ, রসুল, মালায়েক, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। ঈমান অর্থহীন হয়ে গেলে স্বভাবতই এই নামায, রোযা, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের ইবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হলে ঈমান এবং ঈমানভিত্তিক সমস্ত ইবাদত অর্থহীন সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা কী? আকিদা হচ্ছে কোনো জিনিস দিয়ে কী হয়, সেটার উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হচ্ছে আকিদা। যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত ইবাদত, আমল নিষ্ফল।

বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, কেউ আপনাকে একটি গাড়ি উপহার দিল। কিন্তু আপনি জানেন না যে, গাড়ির উদ্দেশ্য (আকিদা) কী? তখন আপনি কি করবেন? আপনি হয়তো গাড়ির আরামদায়ক সিটে বসে, এসি চালিয়ে গান শুনবেন এবং ভাববেন, গাড়িটা এজন্যই দেওয়া হয়েছে। এটা হলে আপনাকে গাড়ি উপহার দেওয়াটা অর্থহীন হল। এবং সেক্ষেত্রে আপনার কাছে গাড়ির বিভিন্ন অংশের গুরুত্বও বদলে যাবে। আপনি হয়তো গাড়ির গদিওয়ালা সিট, মিউজিক সিস্টেম, এসি ইত্যাদিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাববেন আর গাড়ির ইঞ্জিন, ব্রেক সিস্টেম, স্টিয়ারিং সিস্টেম, টায়ার, জ্বালানি সিস্টেম ইত্যাদি হয়ে যাবে অতি তুচ্ছ। একই কথা ইসলামের বেলায়ও প্রযোজ্য। ইসলামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার রসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে' (সুরা হাদিদ ২৫)। অন্যত্র তিনি বলেছেন, কেতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম) চালিয়ে যাও যতদিন না ফেতনা নির্মূল হয় এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় (সুরা আনফাল ৩৯)। সুতরাং সংক্ষেপে ইসলামের আকিদা হচ্ছে- আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন, দীনুল হক জেহাদ ও কেতালের মাধ্যমে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত রকমের ফেতনা, যুদ্ধ রক্তপাত বন্ধ করে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে ইবলিসের সঙ্গে চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে বিজয়ী করা। এটা হল দীনের মুখ্য উদ্দেশ্য, বাকি সব কিছু হচ্ছে এই উদ্দেশ্য অর্জনের পরিপূরক।

ইসলামের উদ্দেশ্য বোঝায় যায় নির্যাতিত সাহাবি খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে। মক্কী যুগে যখন সাহাবিদেরকে কাফেররা নির্মমভাবে নির্যাতন করছিল, সে সময় তিনি এসে রসুলাল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আর সহ্য হচ্ছে না, আপনি দোয়া করেন যেন এরা সব ধ্বংস হয়ে যায়। রসুলাল্লাহ তখন কাবা শরিফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, কী বললে? তখন খাব্বাব (রা.) আবারও একই আরজ করলেন। তখন রসুল (সা.) বললেন, শোনো, সময় আসছে একটা সুন্দরী মেয়ে একা সানা থেকে হাদরামাউত যাবে। তার মনে এক আল্লাহ আর বন্য জীবজন্তু ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না (বোখারি)। দেখুন, এখানে আল্লাহর রসুল কী বললেন? তিনি এমন একটি সমাজের ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যেখানে একজন সুন্দরী যুবতী অলঙ্কার পরিহিতা নারীও সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। কেউ তার কোনো ক্ষতি করবে না, তার সম্পদ ও সম্ভ্রম হারানোর আশঙ্কা থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বময় এমন নিরাপদ একটি মানবসমাজ গঠন করাই ইসলামের উদ্দেশ্য, বিশ্বনবীর আগমনের উদ্দেশ্য। আজকে লক্ষ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া মুসলমানদের সামনে ইসলামের এই উদ্দেশ্যটি নেই। ইসলামকে এখন একটি উপাসনাসর্বস্ব ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করা হয়েছে। অগণিত জাঁকমকমপূর্ণ মসজিদে কোটি কোটি মুসল্লি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন, বহু আমল করছেন কিন্তু তাদের জীবন ঘোর অশান্তিতে পূর্ণ। তারা জানে না নামাজের উদ্দেশ্য কী, দীনের উদ্দেশ্য কী, কীভাবে দীন প্রতিষ্ঠা হবে। ইসলামের আকিদা ভুল হওয়ার কারণে তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করছেন না, ফলে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তিও আসছে না।

আমরা যখন ইসলামের আগমনের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জানতে পারব তখনই আমরা বুঝতে সক্ষম হব যে, আমাদের এখন এই দীনটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নাহলে ঐ শান্তিময় সমাজ গঠন সম্ভব হবে না। ইসলামের সমস্ত আমল একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পর্কিত ঠিক যেভাবে একটি গাড়ির প্রতিটি যন্ত্রাংশ একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এজন্য আক্দ শব্দ থেকে আকিদার উৎপত্তি যার অর্থ গ্রন্থি বা গেরো। কতগুলো ফুল আলাদা আলাদা একটি সুতা দিয়ে গাঁথলে সেটা মালা হয়। তেমনি ইসলামের আমলগুলোকেও একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে। যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হল ইসলামের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রক্রিয়া হচ্ছে জেহাদ ও কেতাল। জেহাদের জন্য প্রয়োজন পাঁচদফা কর্মসূচি। কর্মসূচি হচ্ছে মো'মেনের চরিত্র। এই চরিত্র অর্জনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রশিক্ষণ। সেই প্রশিক্ষণ হচ্ছে সালাহ, সওম ইত্যাদি। এই চরিত্র অর্জনের পর মো'মেন জেহাদ করে দীন প্রতিষ্ঠা করবে যার ফল হবে শান্তি। শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তার দায়িত্ব পূর্ণ করবে। এভাবে যখন আমরা ইসলামের সকল আমলের যোগসূত্র জানতে পারব তখন ইসলাম সামগ্রিক রূপে আমাদের সামনে ধরা দেবে। এই সামগ্রিক রূপটি জানার নামই হচ্ছে আকিদা (Comprehensive Concept)।

মহানবীর (সা.) আগমনের উদ্দেশ্য

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ কেন আখেরি নবীকে পাঠিয়েছেন তা অন্তত তিনটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাঁর রসুলকে হেদায়াহ ও সত্যদীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি একে অন্যান্য সকল (মানবরচিত) দীনের উপর বিজয়ী করেন'। (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)।

এখানে হেদায়াহ শব্দের অর্থ হচ্ছে- সঠিক পথনির্দেশনা (Right Direction)। আল্লাহর পাঠানো এই সঠিক পথনির্দেশনা হচ্ছে, জীবনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া আর কারো হুকুম বিধান না মানার অঙ্গীকার। আর সত্যদীন হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, রাষ্ট্রীয়, সামরিক এবং আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রের সংকট সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান, যাকে এক কথায় বলে জীবনব্যবস্থা (System of life)। সকল জীবনব্যবস্থার ভিত্তি থাকে। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হল ঐ হেদায়াহ- 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই', এই সিদ্ধান্ত।

এই জীবনব্যবস্থা যদি মানুষের বাস্তবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিতই না হয় তাহলে এটি নাজিল করাই অর্থহীন হয়ে যায়। সেজন্য পবিত্র কোর'আনের বহু আয়াতে দীন প্রতিষ্ঠার হুকুম দেওয়া হয়েছে (সুরা শুরা ১৩)। কোন পদ্ধতিতে দীন প্রতিষ্ঠা হবে সেটাও তিনি শত শত আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে জেহাদ ও কেতাল - সর্বাত্মক সংগ্রাম ও যুদ্ধ। মহানবী আল্লাহর এই নির্দেশ অনুসরণ করতে গিয়ে বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ (কেতাল) চালিয়ে যেতে যতদিন না তারা আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে না নেয় (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারি)। দীন প্রতিষ্ঠার এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তিনি সারাটি জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম, অকল্পনীয় ত্যাগ, কোরবানি ও শতাধিক যুদ্ধ করেছেন।

সুতরাং সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা যায়, দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল মানবজীবন থেকে যাবতীয় অন্যায় অবিচার অশান্তি যুদ্ধ রক্তপাত হানাহানি দূর করে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, মানবাধিকার এক কথায় শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। আর মহানবীর আগমনের উদ্দেশ্য হল এই দীনটাকে সর্বাত্মক সংগ্রামের (জেহাদ) মাধ্যমে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করা, কেননা পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত তিনিই শেষ নবী ও শেষ পথ প্রদর্শক। দীন প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে, আর শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে ইবলিসের সঙ্গে করা চ্যালেঞ্জে আল্লাহ পাক বিজয়ী হবেন এবং মানুষ খলিফা হিসাবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে প্রমাণিত হবে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ করে এই পৃথিবীতে আল্লাহকে বিজয়ী করবেন, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন (সুরা বাইয়েনাহ ৭) এবং তাদের সকল গোনাহ ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করার অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ (সুরা সফ ১২)।

দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি

মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে তার একটি জীবনব্যবস্থা (System of life) থাকতেই হবে। এই জীবনব্যবস্থা হতে পারে দুই প্রকার- আল্লাহর তৈরি ও মানুষের তৈরি। মানুষ যদি আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে নেয় তাহলে সে হবে মো'মেন, মুসলিম (সুরা নিসা ৬৫)। যদি আংশিকভাবে আল্লাহর দীন গ্রহণ করে তাহলে সে হবে মোশরেক (সুরা বাকারা ৮৫)। আর যদি সে আল্লাহর দীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে হবে কাফের (সুরা মায়েদা ৪৪)। আল্লাহ তো জীবনবিধান দিলেন, এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই দীন প্রতিষ্ঠা হবে কীভাবে? এটা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন- দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হবে জেহাদ ও কেতাল। তিনি বলেন,

০১. তোমাদের জন্য কেতাল (সশস্ত্র সংগ্রাম) ফরজ করে দেওয়া হল যদিও তোমরা তা অপছন্দ কর। (সুরা বাকারা ২১৬)।
০২. কেতাল চালিয়ে যাও যতদিন না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর হয়ে যায় (সুরা আনফাল ৩৯)।
০৩. তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় কেতাল (যুদ্ধ) করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে উদ্ধার করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী। (সুরা নিসা ৭৫)

এখন এই জেহাদ করার জন্য লাগবে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি। সেটাও আল্লাহ তাঁর রসুলকে দান করেছেন আর রসুল তা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। সেগুলো হচ্ছে-

০১. ঐক্যবদ্ধ হওয়া
০২. নেতার আদেশ শোনা (শৃঙ্খলা)
০৩. নেতার আনুগত্য
০৪. হিজরত (শেরক ও কুফর পরিত্যাগ)
০৫. জেহাদ

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হল, সে নিশ্চয় তার গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলল- যদি না সে তওবা করে ফিরে আসে; এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামায পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারি (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল ইমারাত, মেশকাত]।

দীন ও দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি

আল্লাহ মানবজাতিকে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তিতে (ইসলামে) থাকার জন্য একটি দীন দিলেন, যার বুনিয়াদ পাঁচটি (তওহীদ, নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা) এবং এ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ দফার একটি কর্মসূচিও তাঁর রসুলের মাধ্যমে দিলেন (ঐক্য, আদেশ শোনা, আদেশ পালন করা, হিজরত ও সর্বাত্মক সংগ্রাম করা)। যেহেতু ঐ দীন মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে ঐ দীনের মূল্য নেই, সেহেতু দীন প্রতিষ্ঠার ঐ ৫ দফা কর্মসূচিটি ৫ দফা বিশিষ্ট দীনের সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমান মূল্য। এ কথাটা ভালো করে বোঝার জন্য একটি অনুচিত্র পেশ করছি।

১. হেদায়াহ ও সত্য দীন	২. হেদায়াহ ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা
তিনি (আল্লাহ) তার রাসুলকে (সা.) হেদায়াহ ও সত্যদীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন →	এই জন্য যে তিনি যেন এটাকে অন্য সমস্ত দীনের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। (সুরা ফাতাহ - ২৮, সুরা তওবা ৩৩ ও সুরা সফ্ ৯)
সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে বিশ্বাস কোরেছে, তাতে আর সন্দেহ করে নাই →	এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কোরেছে। (সুরা হুজরাত ১৫)
ক) আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ইমান- (তওহীদ) খ) সালাত (নামায) গ) যাকাত ঘ) হজ্ব ঙ) সওম (রোযা)	ক) ঐক্য খ) (নেতার আদেশ)- শোনা গ) (ঐ আদেশ)- পালন করা ঘ) হিজরত করা ঙ) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা

১ নং ছক হচ্ছে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক শেষ দীনুল ইসলাম আর ২নং ছক হচ্ছে সেই দীনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া, তরিকা, কর্মসূচি। ১ নং না থাকলে ২ নং এর কোনো প্রয়োজন নেই এবং ২ নং না থাকলে ১ নং অর্থহীন। একটি অন্যটির পরিপূরক। **সুতরাং দু'টোরই মূল্য, গুরুত্ব একই সমান। ১ নং ছকের পাঁচ দফার যে কোন একটাকে বাদ দিলে বা অস্বীকার করলে যেমন মো'মেন বা মুসলিম থাকা যায় না, তেমনি ২ নং ছকের পাঁচ দফার যে কোন একটিকে অস্বীকার করলে বা এ থেকে আধ হাত মাত্র সরে গেলেই গলা থেকে ইসলামের বাঁধন খুলে ফেলা হল।** ইসলামের বাঁধন গলা থেকে খুলে ফেলা অর্থ দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া, মোশরেক কাফের হয়ে যাওয়া। আল্লাহর রসুলের (সা.) ৬০/৭০ বছর পর থেকেই ঐ ২নং ছক (কর্মসূচি) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। ১ নং ছকের প্রথম দফা তওহীদও আর প্রকৃত তওহীদ নেই, ওটা ব্যক্তিগত অর্থাৎ আংশিক তওহীদে পরিণত হয়েছে। আংশিক তওহীদ

অবশ্যই শেরক, যে শেরক ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঐ আংশিক তওহীদের কারণে পরের দফাগুলি অর্থাৎ নামায, যাকাত ইত্যাদিও অর্থহীন হয়ে গেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) চান যে তার এই উম্মাহ একটি কেন্দ্র, একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকে (সুরা সফ ৪)। **এই ঐক্যের বন্ধনের বাইরে যেন একটিও মানুষ না থাকে সে জন্য বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি ইমামের (নেতার) বায়াত (আনুগত্য) না নিয়ে মারা গেল সে আইয়ামে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার যুগের) মৃত্যুবরণ করল।** (হাদিস- মুয়াবিয়া (রা.) থেকে আহমদ)।

উম্মাহ সৃষ্টি

আল্লাহর রসুল যখন কালেমা তওহীদের দিকে আহ্বান শুরু করলেন, তখন অল্প কিছু মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনল, আর অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করল। যারা ঈমান আনলেন তারা হলেন মো'মেন ও উম্মতে মুহাম্মদী। আর যারা প্রত্যাখ্যান করল তারা কাফের মোশরেকই রয়ে গেল। ঈমান আনার পর হজরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! এখন আমার কী কাজ?' রসুলাল্লাহ বললেন, 'আমার যে কাজ, তোমারও সেই একই কাজ।' পূর্বেই বলেছি, রসুলাল্লাহর কাজ হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে সমগ্র পৃথিবীতে জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) ও কেতালের (সশস্ত্র সংগ্রাম) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা। এত বিরাট ও সময়সাপেক্ষ কাজ একজন ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে করা অসম্ভব। তাই তিনি একটি উম্মাহ বা জাতি গঠন করলেন যারা তাঁর ইন্তেকালের পরও কাজটি চালিয়ে যাবে। তিনি সেই উম্মাহকে সঙ্গে নিয়ে শতাধিক ছোট বড় যুদ্ধ করে জাজিরাতুল আরবের সাড়ে ১২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করলেন। উম্মতে মুহাম্মদীকে তিনি পাঁচ দফা কর্মসূচির কঠিন ছাঁচে ফেলে তাদেরকে ইস্পাতকঠিন ঐক্য, নিখুঁত সামরিক শৃঙ্খলা, নেতার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য শিক্ষা দিলেন। তাদেরকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনসম্পদ উৎসর্গ করার প্রেরণা যোগালেন। তাঁরাও রসুলের সঙ্গে খেয়ে না খেয়ে, গাছের লতাপাতা খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে, শত্রুর আঘাত আঘাতে জর্জরিত হলেন, ঊষর মরু প্রান্তরে নির্বাসিত জীবনে অবর্ণনীয় কষ্টলাভ করলেন, বাড়িঘর, স্ত্রী-পুত্র, ক্ষেত খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ফেলে দেশান্তরিত হলেন। রণাঙ্গনে আহত রক্তাক্ত হলেন, শেষ পর্যন্ত জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হলেন। তাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তারা সকলে ছিলেন মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, শাহাদাতের জন্য আকুলপ্রাণ (Utter desire for death)। তারা ছিলেন নেতার আদেশে সমস্ত কিছু কোরবান করার জন্য প্রস্তুত। তারা ছিলেন শিরক-কুফরের প্রতি আপসহীন। তারা বলতেন, আমরা বেঁচেই আছি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য। দুনিয়াতে আমরা বেঁচে থাকার জন্য এক মুঠো খাবার আর লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছু চাই না (Muslim Conquest of Egypt and North Africa by A I Akram)। এভাবে তারা একটি

ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শক্তিতে বলীয়ান, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী একটা উম্মাহয় পরিণত হলেন যাঁরা বিশ্বের ইতিহাস ও মানচিত্রকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছিলেন। রসুলাল্লাহর ইন্তেকালের পর তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য আরবভূমি থেকে তলোয়ার হাতে বানের ঢলের মতো বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং অকল্পনীয় কম সময়ের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দুই দুইটি পরাশক্তি রোমান ও পারস্যকে একসঙ্গে সামরিকভাবে পরাজিত করে অর্ধ দুনিয়াতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে যারা রসুলাল্লাহর উপরে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্বকে স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন তারাই হলেন প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী। তাঁদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর মায়া-মমতায় পূর্ণ।" (সুরা ফাতাহ ২৯)।

আরবের কী পরিবর্তন হয়েছিল

এটা সর্বসম্মত ইতিহাস যে, ইসলামপূর্ব আরবরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশ্লীলতা, অন্ধবিশ্বাস তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে সেই যুগটিকেই বলা হয় অন্ধকারের যুগ, আইয়্যামে জাহেলিয়াত। অন্যান্য জাতিগুলো এজন্য তাদেরকে প্রচণ্ড অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত। কিন্তু দীনুল হক ইসলাম সেই আরবদেরকে পুরোপুরি পাল্টে দিল। তারা হয়ে গেল মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা, সর্বদিকে সর্বসেরা। আরবদের এই অভূতপূর্ব উত্থান আজও গবেষকদের কাছে বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। ইতঃপূর্বে গোত্রীয় স্বার্থই ছিল তাদের সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তি, সেখানে ইসলাম তাদেরকে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করল। যারা বংশানুক্রমে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দাঙ্গায় লিপ্ত থাকত তারাই পরস্পরের ভাই হয়ে গেল। যারা ছিল চরম উশৃঙ্খল, ইসলাম এসে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস অনভ্যাস, পোশাক-আশাক, পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, সামরিক, জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে অনন্য শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে দিল। তারা হয়ে উঠল অন্য জাতির সামনে দৃষ্টান্ত। যে আরবরা ছিল উদ্ধত, অবাধ্য তারা আল্লাহর নবীর প্রতি, ইসলামের শিক্ষার প্রতি এতটাই অনুগত হয়ে উঠল যে নেতার হুকুমে তারা জীবন দিতেও পিছপা হত না। পূর্বে আরবদের মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের কোনো মানদণ্ড ছিল না, তারা লড়াই করত কেবল গোত্রের জন্য। কিন্তু ইসলামের আদর্শে তারা সেই হাজার বছরের গোত্রবাদ ভুলে গিয়ে আল্লাহর জন্য, ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে শুরু করল। ইসলাম এসে আরবদের মধ্য থেকে শ্রেণি বৈষম্য, বংশীয় আভিজাত্য ও দাস প্রথাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। মহানবীর উম্মাহর মধ্যে আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র, প্রভু ক্রীতদাসের আকাশ-পাতাল ব্যবধান দূর হয়ে গিয়েছিল। মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি ছিল তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ডের প্রতি সতর্কতা। আরবে চুরি ছিল সর্বব্যাপী। আর ডাকাতিকে

বীরত্বের কাজ ভাবা হত। সেখানে ইসলাম এমন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, মানুষ দরজা খুলে ঘুমাত, দোকান খোলা রেখে চলে যেত, কিন্তু কোনো চুরি হত না। একজন সুন্দরী যুবতী নারী অলংকার পরে শত শত মাইল পথ নির্ভয়ে চলতে পারত। মাসের পর মাস আদালতে কোনো মামলা আসত না। ধনীরা দান গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পেত না। যে আরবরা মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত, সেই আরবে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করল ইসলাম। সর্বোপরি, ইসলাম তাদেরকে নির্ভীক দুর্ধর্ষ অপরাজেয় যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করেছিল যারা তাদের বহুগুণ শক্তিশালী সামরিক শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

মো'মেন মুসলিম বনাম কাফের মোশরেক

মো'মেনঃ মো'মেন কারা তা পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মো'মেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর কোনো সন্দেহ করে না এবং সম্পদ-জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। (সুরা হুজরাত ১৫)। এ সংজ্ঞার আলোকে দেখা যায় মো'মেন হওয়ার দুটো শর্ত।

এক) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ তওহীদ; ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের কোনো অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম-বিধান ছাড়া আর কারো হুকুম-বিধান না মানার অঙ্গীকার।

দুই) আল্লাহর নাজিলকৃত সত্যদীন ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করে জেহাদ, সর্বাত্মক সংগ্রাম করা।

প্রচলিত ধারণা মতে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং নামাজ রোজাসহ অন্যান্য আমল বেশি বেশি করে তারা হচ্ছে মো'মেন। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মো'মেন হওয়ার শর্ত নয়। এ বিশ্বাস তো ইবলিসেরও আছে। মো'মেন হওয়ার শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করা এবং অন্য সকল সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা; সেই সঙ্গে দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ করা। এই মো'মেনের সঙ্গে আল্লাহর ওয়াদা যে তিনি তাকে দুনিয়াতে কর্তৃত্ব বা খেলাফত দিবেন এবং তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে দাখিল করবেন। (সুরা নূর ৫৫)। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞার আলোকে বর্তমানের ১৮০ কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী মো'মেন থাকে না; কেননা তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে মানুষের সার্বভৌমত্ব ও জীবনবিধান মেনে নিয়েছে এবং তারা দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদও জাতিগতভাবে পরিত্যাগ করেছে।

মুসলিমঃ আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন, হে মো'মেনগণ! তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সুরা ইমরান ১০২)। এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মো'মেন ও মুসলিম আলাদা বিষয়। মুসলিম শব্দটি এসেছে তসলিম থেকে যার অর্থ বশ্যতা স্বীকার করা, আত্মসমর্পণ করা। পবিত্র কোর'আনের একটি আয়াত থেকে মুসলিমের সংজ্ঞা জানতে পারা যায়। সেটা হচ্ছে, আরবরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। হে

রসুল! আপনি বলুন, তোমরা তো ঈমান আনোনি, বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার (তসলিম) করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল হবে না। (সুরা হুজরাত ১৪)।

সুতরাং বোঝা গেল, যারা আল্লাহর দেওয়া দীন 'ইসলাম'- এর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তারা হচ্ছে মুসলিম। ইসলামের সমস্ত পণ্ডিতদের সংজ্ঞা মোতাবেক, যারা বিনা শর্তে, বিনা প্রশ্নে আল্লাহর সমস্ত হুকুমের প্রতি গর্দান পেতে দেয় (অর্থাৎ আনুগত্য করে) তারা হচ্ছে মুসলিম। এ দিক থেকেও এ জাতি আল্লাহর দীনের হুকুমের আনুগত্য করছে না। বরং তারা কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের তৈরি হুকুম-বিধানের প্রতি গর্দান পেতে দিয়েছে। **সুতরাং তারা মুসলিম নয়।** যারা ইসলাম ছাড়া, কোর'আন ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, সাদরে গ্রহণ করে তারা কোনো যুক্তিতেই মুসলিম হতে পারে না।

কাফের: আল্লাহ বলেছেন, মানুষ দুই প্রকার- মো'মেন ও কাফের (সুরা তাগাবুন ২)। তাই মো'মেনের সংজ্ঞায় যারা পড়ে না তারা স্বভাবতই কাফের। তথাপি আল্লাহ স্পষ্ট করে কাফেরের সংজ্ঞাও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে যারা হুকুম (শাসন) করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এ থেকেও বোঝা যায়, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে জাতীয়, রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষের তৈরি বা পাশ্চাত্য সভ্যতার তৈরি আইন-কানুন, জীবনবিধান দিয়ে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করায় এই মুসলিম জনগোষ্ঠী কার্যত কাফেরে পরিণত হয়েছে।

মোশরেক: 'মোশরেক' শব্দটি এসেছে 'শিরক' থেকে যার মানে হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করা। যারা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানলো আর কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি হুকুম বিধান মানলো তারা শিরক করল অর্থাৎ মোশরেক হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ মানো না? যারা এমনটা করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কেয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি। (সুরা বাকারা ৮৫)। আল্লাহ কোনো অবস্থাতেই শিরক ক্ষমা করবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন, অন্য ছোট বড় পাপ তিনি যাচ্ছে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। (সুরা নিসা ৪৮, ১১৬)। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম বা অন্যায়। (সুরা লোকমান ১৩)। তিনি আরো বলেছেন, মোশরেকরা নাপাক। (সুরা তওবা ২৮)। এখন বাস্তবতা হচ্ছে এই মুসলিম জনগোষ্ঠীটিও বর্তমানে আল্লাহর কেতাবের কিছু হুকুম মানছে, আর অধিকাংশ হুকুম মানছে না। যেমন তারা নামাজ রোজা করছে আল্লাহর হুকুমে কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থায় মানছে মানুষের তৈরি বিধান অনুযায়ী। এটাই হচ্ছে শিরক। এই শিরক থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, আল্লাহ ছাড়া সকল হুকুমদাতাকে অস্বীকার করা (এটাই তওহীদ) এবং আল্লাহর দীনে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করা। (সুরা বাকারা ২০৮)।

শরিয়াহ ও মারেফত

মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো শুধুমাত্র দেহসর্বস্ব জীব নয়। তার দেহ যেমন আছে, তেমনি আত্মাও আছে। দেহের যেমন চাহিদা রয়েছে, তেমনি আত্মারও চাহিদা রয়েছে। দেহ ও আত্মা মিলেই একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তাই আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রসুলের (সা.) মাধ্যমে যে জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন, তা শরিয়াহ (বিধিবিধান) ও মারফতের (আধ্যাত্মিকতা) নিখুঁত ভারসাম্যযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবরচিত যে কোনো জীবনব্যবস্থার সঙ্গে এর বড় পার্থক্য হল, এতে আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ের পাশাপাশি মানুষের আধ্যাত্মিক সংকটের সমাধানও রয়েছে।

কালেমা তওহীদ ঘোষণার মাধ্যমে একজন মানুষ তার আত্মা, হৃদয় ও অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি ধারণ করেন। তিনি আল্লাহকে একমাত্র জীবনবিধাতা ও ইলাহ হিসেবে সর্বান্তকরণে মেনে নেন। তিনি নিজের সমস্ত আনুগত্য ও ভক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে, যখন তিনি আল্লাহর বিধানগুলো একে একে মানতে শুরু করেন, তখন শরিয়াহ বাস্তবায়ন শুরু হয়। আল্লাহর রাসুল (সা.) এই দুইয়ের (শরিয়াহ ও মারফত) সমন্বয়ে একটি বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ফলে সাহাবিগণ আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে জাগতিকভাবেও শৃঙ্খলিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। তারা আরবের অশিক্ষিত ও বর্বর জাতি থেকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। সমাজ থেকে অন্যায়, অশান্তি ও অবিচার দূর হয়ে গিয়েছিল। মানুষের এতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছিল যে, চুরি বা ব্যভিচারের মতো দণ্ডনীয় অপরাধ করার পর তারা অনুতপ্ত হয়ে নিজেরাই রাসুলের (সা.) দরবারে গিয়ে শাস্তি প্রার্থনা করতেন। অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতেন, কারণ তাদের অন্তরে সর্বদা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় জাগ্রত থাকত। ইসলামের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তাকওয়া'।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, উম্মতে মোহাম্মদি যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তখন দীনের শরিয়াহ ও মারফতের মধ্যে ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে গেল। বর্তমানে আমরা দেখছি, একদিকে একদল মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে এসে শরিয়তের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন, কিন্তু জাতীয় জীবনে যে আল্লাহর হুকুম চলে না সেদিকে কোনো নজর নেই। অন্যদিকে, মারফত বা সুফিবাদী ঘরানার একদল বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক তরিকা অবলম্বন করছেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করছেন। অথচ মানবসমাজ অন্যায়, অবিচার ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে এক জ্বলন্ত নরকে পরিণত হয়েছে, সেদিকে তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। এটাই হল ভারসাম্যহীন সুফিবাদ যা পারস্য বিজয়ের পর সেখান থেকে অপরাপর মুসলিম ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করেছিল।

আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর উম্মাহর চরিত্রে শরিয়াহ ও মারফতের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং, প্রকৃত ইসলামে আধ্যাত্মিকতা বলতে বুঝায় অন্তরে, আত্মায় আল্লাহর উপস্থিতি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে মানা। তিনি আমার সব কার্যাবলী দেখছেন এবং হাশরের দিন তাঁর সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে - এ অনুভূতিকেই বলা হয় জিকির বা স্মরণ। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহর উপস্থিতিকে গণ্য করে নিজেকে যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্ম থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি, নিজের জীবন ও সম্পদের, পুত্র-পরিবারের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর হুকুম-বিধান মানবজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া হচ্ছে ইসলামের মারেফত বা আধ্যাত্মিকতা।

কিন্তু একটি গোষ্ঠী মুসলিম জাতির জীবন থেকে সংগ্রামকে বাদ দেওয়ার জন্য অসংখ্য জাল হাদিস রচনা করেছে যেমন 'আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদ হচ্ছে জেহাদে আকবর (বড় জেহাদ)'। হাফেজ ইবনে হাজারের মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে হাদিস বলেই স্বীকার করেননি, বরং বলেছেন এটি একটি আরবি প্রবাদ বাক্য মাত্র। আর হাদিসটি যে সত্য নয় তার বড় প্রমাণ সুরা ফোরকানের ৫২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন: 'কাফেরদের কথা শুনো না, মানো না এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর, চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাও।' অর্থাৎ আল্লাহ নিজে বলেছেন, জেহাদে আকবর বা বড় জেহাদ হচ্ছে সত্য অস্বীকারকারী ও অন্যায়কারী কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা।

আজ দুনিয়াময় মানবতার চরম বিপর্যয় ঘটেছে। আইনের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষ মানুষ দুরাচারী জীবে পরিণত হচ্ছে। এ সময় প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং শরিয়াহ- দুটোই জরুরি। এই দুইয়ের সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা তুলে ধরছে হেযবুত তওহীদ যা একদিকে মানুষকে করবে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ, অকপট মো'মেন; অপরদিকে তাকে বানাবে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বত্যাগী, দুর্ধষ, শাহাদাত-পিপাসু যোদ্ধা। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে হাজার বছর আগে বাংলায় আগত শাহজালাল (রহ.), শাহ পরান (রহ.), শাহ মাখদুম (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিগণ যাঁদেরকে আমরা সুফি-সাধক, পীর-দরবেশ, ওলি-আউলিয়া এবং বুজুর্গ বলে জানি, তাঁরা আসলে আধ্যাত্মিক জগতেও যেমন কামেল ছিলেন, তেমনি রণজয়ী যোদ্ধা ছিলেন। এটাই দীনের ভারসাম্যের প্রকৃত উদাহরণ। পক্ষান্তরে যাঁরা সমাজের যাবতীয় সমস্যার প্রতি উদাসীন থেকে দরবার খানকার নির্জনতা বেছে নিয়েছেন তাঁরা কখনো আল্লাহর কুরবিয়াত হাসিল করতে পারবেন না।

সালাহ: মো'মেনের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ

সমগ্র মানবজাতির জীবনব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার মত এত বিরাট কাজ যে জাতি করবে তাদের সেই চরিত্র সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। ইসলামে সেই প্রশিক্ষণ কোথায়? পূর্বে বলে এসেছি, দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ রসুলকে একাকী ছেড়ে দেননি, দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হিসাবে জেহাদ এবং সেই জেহাদ করার জন্য পাঁচ দফা কর্মসূচিও তিনিই দান করেছেন। কিন্তু কর্মসূচি মোতাবেক কাজ করার জন্য লাগবে তার উপযোগী চরিত্র ও গুণাবলি (Attributes)। সেই চরিত্র অর্জনের প্রশিক্ষণ হিসাবে আল্লাহ সালাহ, যাকাত, হজ ও সওম ইত্যাদি আমলের ব্যবস্থা দিয়েছেন। সালাহ হচ্ছে মো'মেনের কাঙ্ক্ষিত চরিত্র অর্জনের প্রশিক্ষণ। এ কারণেই সালাতের বাহ্যিক দৃশ্য পৃথিবীতে কেবল একটি দৃশ্যের সঙ্গেই মিলে, সেটা হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্যারেড বা কুচকাওয়াজের দৃশ্য। কারণ একটি সেনাবাহিনীর যে কাজ অর্থাৎ সংগ্রাম, উম্মতে মোহাম্মদীরও সেই একই কাজ। তাই সালাহ একটি ছাঁচ বা ডাইসের মত বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে জেহাদের উপযোগী চরিত্র দান করে। এ কারণেই রসুলাল্লাহ বলেছেন, ইসলাম একটি ঘর, সালাহ হচ্ছে খুঁটি, জেহাদ তার ছাদ (হাদিস- মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে ইবনে মাজাহ, মেশকাত)। পৃথিবীর যাবতীয় খুঁটির একটাই উদ্দেশ্য- ছাদকে ধরে রাখা। তেমনি সালাতেরও একমাত্র উদ্দেশ্য হল জেহাদকে সমুন্নত রাখা অর্থাৎ জেহাদ করতে যে শারীরিক সক্ষমতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা লাগে সেটা মো'মেনের চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করা। এজন্যই বলা হয়েছে সালাহ কায়েম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করতে। সালাতের মূল কাজ মো'মেনের মধ্যে উল্লিখিত পাঁচ দফার গুণাবলি সৃষ্টি করা। যখন সালাতে এসে বিভিন্ন চরিত্র, বয়স, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার মানুষ এক কাতারে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকে না; তাদের মধ্যে ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা সঞ্চারিত হয় যা কর্মসূচির প্রথম দফা। সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল মিলিয়ে শতাধিক নিয়ম কানুন পালন করতে হয়, যা মো'মেনকে শৃঙ্খলার শিক্ষা দান করে। যখন তারা ইমামের তাকবিরের সাথে একত্রে একটি দেহের ন্যায় ওঠবস করে তারা সামষ্টিকভাবে নেতার প্রশ্নহীন শর্তহীন দ্বিধাহীন আনুগত্য চর্চা করে। এছাড়া রুকু ও সেজদার মাধ্যমে তারা আল্লাহর প্রতি সমর্পণ ও আনুগত্যের প্রকাশ ঘটায়। কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তারা তাদের লক্ষ্যের ঐক্য প্রকাশ করে। সালাতের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে সব তাসবিহ, সুরা ও দোয়া পাঠ করতে হয় সেগুলোর মর্ম উপলব্ধির মাধ্যমে এবং সেই মহান সত্তার উপস্থিতি ও তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার অনুভূতিকে জাগ্রত করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জিত হয়। এছাড়াও সালাহ মো'মেনের চরিত্রে সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতাসহ অগণিত গুণাবলির সমাবেশ ঘটায়। এই সালাতের মাধ্যমেই উম্মতে মোহাম্মদীর চরিত্রে দুর্বার যোদ্ধা চরিত্রের পাশাপাশি অনন্য আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সালাতের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হয়েছে এবং একে নিছক উদ্দেশ্যহীন প্রার্থনা, উপাসনায় পরিণত করা হয়েছে। ফলে সালাতের উপর মহা গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এর দ্বারা আর সেই বিশ্বজয়ী মহান জাতি সৃষ্টি হচ্ছে না।

হজঃ মুসলিম উম্মাহর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মহাসম্মেলন

প্রচলিত ধারণামতে দীনের অন্যতম বুনিয়াদ হজে উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপমুক্তি ও আত্মশুদ্ধি। কিন্তু ইসলামের সকল আমলের মত হজও আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় বিষয়ের ভারসাম্যযুক্ত। হজ যদি নিছক আধ্যাত্মিক বিষয় হত, তাহলে সেটার জন্য হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। কারণ আল্লাহ তো সর্বত্র আছেন।

হজের মাধ্যমে আল্লাহ এ জাতিকে নানামুখী শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু হজের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলার দরুন সেসব শিক্ষা আমরা অনুধাবন করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতির সমস্ত কর্মকাণ্ড হচ্ছে এক অবিচ্ছিন্ন এবাদত। যেমন জামাতে নামাজের উদ্দেশ্য হলো মুসলিম পাঁচবার তাদের স্থানীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র মসজিদে একত্র হবে, তাদের স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করবে। তারপর সপ্তাহে একবার বৃহত্তর এলাকার জামে মসজিদে জুমার নামাজে একত্র হয়ে ঐ একই কাজ করবে। তারপর বছরে একবার আরাফাতের মাঠে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জাতির নেতৃত্বস্থানীয়রা, একত্র হয়ে জাতির সর্বরকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে, পরবর্তী বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেবে। সেখানে জাতির ইমাম জাতির উদ্দেশে দিকনির্দেশনা দিবেন। এভাবে স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্রমশ বৃহত্তর পর্যায়ে বিকাশ করতে করতে জাতির কেন্দ্রবিন্দু মক্কায় একত্রিত হবে। এটা হচ্ছে সংক্ষেপে এই মহাসম্মেলনের জাগতিক উদ্দেশ্য।

শেষ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগেও মক্কায় হজ হতো, আরাফাতে নয়। শেষ নবী হজকে নিয়ে গেলেন ২০ কিলোমিটার দূরে আরাফাতের ময়দানে, কিন্তু হজের অঙ্গ হিসাবে কাবা তওয়াফ ঠিক রইল। প্রাক-ইসলামের হজের সঙ্গে ইসলামের 'হজের' আনুষ্ঠানিকতায় খুব বেশি তফাৎ ছিল না, এখনও নেই। আসমান জমীনের তফাৎ এসে গেল দু'টো বিষয়ে, দু'টো আকিদায়। একটা হল- কাবার ভেতরের মূর্তিগুলি অদৃশ্য হয়ে গোল, দ্বিতীয় হল মোশরেকদের 'এবাদতের' বদলে একে করা হল বিশ্ব-মুসলিমের বার্ষিক মহা সম্মেলন। যেহেতু মুসলিমের দীন ও দুনিয়া এক, কাজেই হজের জাতীয় দিকটার সঙ্গে মুসলিমের ব্যক্তিগত আত্মার দিক অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাই মুসলিম হজে যেয়ে আরাফাতের ময়দানকে হাশরের ময়দান মনে কোরে নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত বলে মনে করবে। মনে করবে উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল তার কতটুকু সে পূরণ করতে পেরেছে সে হিসাব তাকে আজ দিতে হবে।

কিন্তু যে জন্য পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে এত কষ্ট করে এত লোককে আল্লাহ একটি মাঠে সমবেত করলেন সেই জাতীয় উদ্দেশ্যই আজ হজ্বে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিশ্বময় মুসলিমরা মরছে মরুক, নারীরা ধর্ষিত হোক তাতে হাজীদের কী আসে যায়? তারা নিজেরা পাপমুক্ত হলেই হল। তাই এই ভারসাম্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, অকার্যকর হজ মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারছে না।

দীনের বিনিময় কেন নেওয়া যাবে না

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে, দীনের বিনিময় গ্রহণ করা হারাম। যদিও আমাদের সমাজে দীনের বিভিন্ন কাজ করে এক শ্রেণির আলেম ওলামা জীবিকা হাসিল করে থাকে। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে কোনা যাজক বা পুরোহিতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে যেমন নামাজ পড়িয়ে, আজান দিয়ে, কোর'আন খতম করে, ওয়াজ মাহফিল করে, কোর'আন হাদিস তথা দীন শিক্ষা দিয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, বিয়ে পড়িয়ে, দোয়া-মোনাজাত করে, জানাজা ও দাফন পরিচালনা করে, কবর জিয়ারত করে অর্থাৎ পৌরোহিত্য করে অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। আল্লাহ তাঁর দীনের জ্ঞান, হেদায়াতের জ্ঞানের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময়, অর্থমূল্য, স্বার্থসিদ্ধিকে সামানান ক্বালিলা বা তুচ্ছমূল্য বলে বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং মজুরি (উজরান) গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জীবনব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য মানব সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। এটার মালিক কোনো মানুষ নয়, এটা কোনো ব্যবসায়িক পুঁজি বা পণ্য নয়, এটা কোনো গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয় যে কেউ তা বিক্রি করে ভোগ করতে পারে। দীন মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে, তাই এর কোনো পার্থিব বিনিময় চলে না। আল্লাহ বলছেন শুকর খাওয়া হারাম, মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, তারপর বলছেন নিরুপায় হলে তাও খেতে পারো। কিন্তু ধর্মের বিনিময় নেয়া সম্পূর্ণ হারাম যার কোনো ক্ষমা নেই। আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা- (১) নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না, (২) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, (৩) আল্লাহ তাদের পবিত্রও করবেন না, (৪) তারা ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, (৫) তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহি ক্রয় করেছে, (৬) তারা দীন সম্পর্কে ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত আছে, (৭) আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল'। (সুরা বাকারা ১৭৪)।

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ কেবল শেষ রসুলকে বলেছেন, তাদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। এটা তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ (সুরা আনআম ৯০, সুরা ইউসুফ ১০৪, সুরা সা'দ ৮৬, সুরা শুরা ২৩, সুরা তুর ৪০, সুরা মুমিনুন ৭২)। একই কথা বলেছেন অন্যান্য নবীরাও। এ বিষয়ে আল্লাহ কোর'আনে বেশ কয়েকজন নবীর ঘোষণাকে সন্নিবেশিত করেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন নূহ (আ.), হুদ (আ.), লুত (আ.) সালেহ (আ.), শোয়েব (আ.) প্রমুখ। তাদের সকলেরই এক ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক রয়েছে আল্লাহর নিকট (সুরা হুদ ২৯, ৫১, ১২৭, সুরা শু'আরা ১০৯, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, সুরা ইউনুস ৭২)। অর্থাৎ শেষ ইসলাম নয় কেবল, পূর্ববর্তী সকল নবীর ইসলামে

দীনের বিনিময় গ্রহণ করা ছিল নিষিদ্ধ। মহানবীর উম্মাহর মধ্যেও যেন কখনও দীনের বিনিময় বা ধর্মব্যবসা প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ এতগুলো আয়াতে একই বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন।

নারীদের অংশগ্রহণ

মানবজাতির অর্ধেক নারী। কাজেই জনগোষ্ঠীর অর্ধেককে বাদ দিয়ে কোনো জাতির উন্নতি কল্পনা করা যায় না। যে সমাজে নারীরা পশ্চাৎপদ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন সে সমাজের অগ্রগতি কোনোদিন সম্ভব নয়। নারী বা পুরুষ কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তারা একে অপরের পরিপূরক। প্রতিকূল পরিবেশে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রয়োজন পেশীবহুল শক্তিশালী শরীর। আল্লাহ পুরুষকে সেই কাঠামো দিয়ে তৈরি করেছেন এবং তাকে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আর নারীকে করেছেন সেবাপরায়ণ ও মমতাময়ী। তার শরীর ও মনকে করেছেন সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের উপযুক্ত। তাই প্রাকৃতিকভাবেই নারী ও পুরুষের দায়িত্বের ক্ষেত্র আলাদা হয়েছে। তবে ইসলাম নারীকে সন্তান লালন ও গৃহস্থালী কাজ ছাড়াও জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং সামরিকসহ সকল অঙ্গনে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করেছে।

ইসলামপূর্ব আরবে নারীর কোনো মানবাধিকার ছিল না। বহু পিতা তার কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত। সেই সমাজকে রসুলাল্লাহ এমন একটি সমাজে রূপান্তরিত করলেন যেখানে নারীরা সকল জাতীয় রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিল। নারীরা পুরুষের পাশপাশি ঈদ, জুমা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সামিল হতেন। সকল আলোচনা অনুষ্ঠানে নারীরা অংশ নিতেন, তারাও রসুলকে পরামর্শ দিতেন। তারা রসুলের সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন, আহতদের সেবা ও চিকিৎসা দিতেন। যুদ্ধের ময়দানে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতেও লড়াই করেছেন। মক্কা ও মদিনার মত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাজার নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেছেন নারীরা। হেযবুত তওহীদ এই সমাজব্যবস্থাটি ফিরিয়ে আনতে চায়। হেযবুত তওহীদ নারীদেরকে তাদের আল্লাহ-প্রদত্ত, রসুলপাক (সা.) এর শিক্ষা অনুসারে তাদের প্রাকৃতিক অধিকার ও সম্মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। তাই হেযবুত তওহীদের নারীরা বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেন, তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়ে সকল কাজে ভূমিকা রাখেন। আমিরের দায়িত্ব থেকে শুরু করে দাপ্তরিক কাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজে, হিসাব রক্ষণ বিভাগের কাজে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, সভা, সমাবেশ, সেমিনার, র‍্যালি, মানববন্ধন, এমনকি পত্রিকা, বই বিক্রির কাজেও নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জুমা, ঈদসহ সকল নামাজে ও মসজিদভিত্তিক কর্মকাণ্ডে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। মোট কথা, নারীদের জ্ঞান, যোগ্যতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, শক্তি, সামর্থ্য, সাহস ইত্যাদি অনুসারে জাতীয় সামাজিক সামষ্টিক রাষ্ট্রীয় সামরিক সকল কাজে আল্লাহ প্রদত্ত শালীনতার মানদণ্ড বজায় রেখে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। ইসলাম এক্ষেত্রে তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও মর্যাদা দিয়েছে।

সঙ্গীত ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা

শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতা। তাই আল্লাহর দীন এগুলোকে হারাম করেনি, বরং এগুলোর সঠিক চর্চার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামপূর্ব আরবে অশ্লীল কাব্যচর্চা হত। রসুলাল্লাহ কাব্যচর্চা নিষিদ্ধ করেননি, শুধু অশ্লীলতা পরিহার করতে বলেছেন। এমনকি আল্লাহও কোর'আন নাজিল করেছেন কাব্যিক ভাষায়। একইভাবে আরবের নাচ-গানে, জীবনাচরণে অশ্লীলতা মিলে মিশে একাকার ছিল। ইসলাম এই অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু গান হারাম করেনি। হালাল ও হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হল, আল্লাহ যা হারাম করেন নি তা হালাল। আল্লাহ কোর'আনে গুটিকয় কাজ, খাদ্য ও বিষয় হারাম করেছেন। তিনি বলেন, 'আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, হারাম করেছেন আল্লাহর নাফরমানি, অন্যায়-অত্যাচার চালানো, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না (সুরা আরাফ ৭:৩৩)।

এখানে তিনটি বিষয়কে হারাম করা হচ্ছে। এক- অশ্লীলতা। দুই- আল্লাহর নাফরমানি অর্থ আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধানের লংঘন করা, তিন- আল্লাহর সঙ্গে শেরক করা। আল্লাহ প্রদত্ত হালাল হারামের বিধি-নিষেধ মেনে যে কোনো কাজ, সেটা শিল্পচর্চা হোক কি দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো কাজ তা ইসলাম পরিপন্থী বা নাজায়েজ কাজ হতে পারে না। রসুলাল্লাহর উপস্থিতিতেও মদীনায় সাহাবীদের বিয়ে শাদি বা অন্য যে কোনো উৎসবে দফ বাজিয়ে গান গাওয়া হতো। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও। এটা মসজিদে সম্পন্ন করো এবং বিবাহ উপলক্ষে দফ (বাদ্য) বাজাও।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।)

সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র যদি হারামই হতো তাহলে পবিত্র কোর'আনে একটি আয়াতেও কি আল্লাহ সেটা উল্লেখ করতে পারতেন না? না। তিনি কোথাও এ জাতীয় কোনো কথাই বলেন নি। বাদ্যযন্ত্র হারাম নয় তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, আসমানি কেতাববাহী প্রধান চার রসুলের অন্যতম দাউদ (আ.) এর মো'জেজাই ছিল তাঁর সুরেলা কণ্ঠ। তিনি বীণা (Harp) নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, যার ছবি ঐ সময়ের মুদ্রাতেও অঙ্কিত ছিল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রসুল ছিলেন মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম মহাপুরুষ, যিনি মাত্র ৯ বছরে ১০৭ টি ছোট বড় যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করেছেন, যিনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য এক মহান বিপ্লব সম্পাদন করেছেন। এমন এক মহা বিপ্লবীর গান-বাজনা নিয়ে পড়ে থাকার অবসর ছিল না। তবু হাদিসে পাই অবসরে নিজ গৃহে অথবা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে গান শোনানো হয়েছে। তিনি নিষেধ করেননি, শুনেছেন। এমনকি মদিনায় এসে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আল্লাহর রসুল (সা.) তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে মিলিত

কণ্ঠে কর্মসঙ্গীত গেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও গান গেয়েছিলেন। - (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।)

জাহেলিয়াতের যুগে আরবে গান আর অশ্লীলতা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই অনেক সাহাবি গানকেই ফাহেশা কাজ বা মন্দ কাজ বলে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁদের এই ভুল ধারণা ভাঙিয়ে দিলেন। আম্মা আয়েশা (রা.) গান পছন্দ করতেন। তাঁর গৃহে রসুলাল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতেই গান গাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(ক) একদিন দুটো মেয়ে রসুলাল্লাহর ঘরে দফ ও তাম্বুরা বাজিয়ে গান গাইছিল। রসুলাল্লাহ শুয়ে ছিলেন। আম্মা আয়েশাও (রা.) গান শুনছিলেন। এমন সময় তাঁর পিতা আবু বকর (রা.) আসেন এবং আম্মা আয়েশাকে (রা.) তিরস্কার করেন। তখন আল্লাহর নবী আবু বকরের (রা.) দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আবু বকর! তাদেরকে তাদের কাজ করতে দাও। আজ তাদের ঈদের দিন।' (সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৯৮৭)।

(খ) আয়েশা (রা.) একটি মেয়েকে লালন পালন করতেন। অতঃপর তাকে এক আনসারের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানস্থল থেকে আয়েশা (রা.) এর প্রত্যাবর্তনের পর রসুলাল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি গীত গাইতে পারে এমন কাউকে সেখানে পাঠিয়েছ?' আয়েশা (রা.) বললেন, 'না'। রসুলাল্লাহ বললেন, 'তুমি তো জান আনসাররা অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়' (মিশকাতুল মাসহাবি)।

(গ) আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (স.) কোনো একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী সাহাবী মহানবী (স.) এর সামনে এসে বললেন যে- 'ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে নিরাপদে আল্লাহ ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান গাইব।' মহানবী (স.) বললেন, 'যদি তুমি মানত করে থাক তাহলে বাজাও। মানত পূর্ণ কর। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগল।' [তিরমিজি, আবু দাউদ]।

সুতরাং আল্লাহর দীনে সংস্কৃতি চর্চার প্রতিটি দ্বার উন্মুক্ত। সকল মানুষের অধিকার রয়েছে তার নিজেকে প্রকাশ করার, বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে তার জ্ঞানকে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ছড়িয়ে দেওয়ার। সে হিসেবে গান, নাটক, কবিতা, শিল্পচর্চা, অভিনয়, চলচ্চিত্র ইত্যাদি অঙ্গনে অশ্লীলতা, মিথ্যা, ধোঁকা, আল্লাহর নাফরমানিমুক্ত সংস্কৃতি চর্চা করার স্বাধীনতা আল্লাহ দিয়েছেন। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবনে আনন্দ-বিনোদনের প্রয়োজন আছে তবে এগুলোই জীবনের মূল কাজ নয়। জীবনের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত করা।

ক্রীড়া

জাতির প্রাণশক্তি হল যুব সমাজ। যুবসমাজকে গতিশীল, আদর্শবান, সুস্থ দেহমনের অধিকারী করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে মাদক ও ডিভাইস আসক্তি, জুয়া, অপরাজনীতি, উগ্রবাদ ও অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন সুস্থ বিনোদন ও নানা ধরনের খেলাধুলা। খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঐক্যচেতনা, নেতৃত্বের গুণাবলি ও যে কোনো সংকট মোকাবেলার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা তৈরি হয়। কিন্তু অনেকেই খেলাধুলাকে হারাম বলে ফতোয়া দেন এবং সময় নষ্ট বলে নিরুৎসাহিত করেন। যদিও আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখি আল্লাহর রসুল শরীর গঠনমূলক ও জাতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল খেলাধুলাকে উৎসাহিত করেছেন এমনকি নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। অলস, অকর্মণ্য ব্যক্তিদের ইসলাম পছন্দ করে না। হাদিসে আছে, আল্লাহ পছন্দ করেন কর্মচঞ্চল, সজীব, প্রাণবন্ত ও সুঠাম দেহের মো'মেনকে। (সহীহ মুসলিম)। তাই রসুলাল্লাহ সাহাবিদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা, কুস্তি, তীর নিক্ষেপ, বল্লম ও তলোয়ার চালানো, ঘোড় দৌড় ইত্যাদির খেলার আয়োজন করেছেন। তবে যে খেলাগুলো জাতিকে সংগ্রামবিমুখ ও অন্তর্মুখী করে সেগুলোকে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন পাশা, লুডো, ক্যারম, ভিডিও গেমস ইত্যাদি। আবার জুয়া খেলাও হারাম কারণ এতে অনৈক্য ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। (সুরা বাকারা ২:২১৯, সুরা মায়েদা ৫:৯০)।

ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গি হেযবুত তওহীদ ধারণ করে। মাননীয় এমামুয্যামান নিজেও ছিলেন একজন ক্রীড়াবিদ। তিনি একাধারে একজন দক্ষ শিকারী, রায়ফেল শ্যুটার, মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট ও ফুটবলার ছিলেন। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে তিনি শ্যুটার হিসাবে পাকিস্তান টিমের প্রতিযোগী হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। জাতীয় খেলা কাবাডিকে আবারও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি 'তওহীদ কাবাডি দল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং দলটি একাধিক জাতীয় টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল। এই দলের উদ্যোগে দেশজুড়ে শত শত কাবাডি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হেযবুত তওহীদের বর্তমান এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম প্রতিষ্ঠা করেন 'পিনাকল স্পোর্টস' নামে একটি সংগঠন যার অধীনে ইতোমধ্যে সারাদেশে অন্তত অর্ধশত ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও হেযবুত তওহীদ প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন জেলায় ম্যারাথন দৌড়, সাঁতার, নৌকা বাইচ, ব্যাডমিন্টন, ম্যারাথন ও বিভিন্ন দেশীয় খেলার আয়োজন করে যাচ্ছে যেখানে নারী-পুরুষ সকলেই অংশ নিচ্ছে। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষার্থীরা নোয়াখালীতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার ও সুনাম অর্জন করে চলেছে। নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা আন্দোলনের সকল নারী ও পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক।

সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা

পৃথিবীতে পাঁচটি বিশ্বধর্মসহ প্রায় সাড়ে চার হাজার ধর্মের অনুসারী রয়েছে। আল্লাহ যখন আদম ও হাওয়াকে (আ.) পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি আদম সন্তানদের জন্য দিক নির্দেশনা (হেদায়াহ) পাঠাবেন (সুরা বাকারা ৩৮)। সেমতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন যুগে হেদায়াহ দিয়ে লক্ষ লক্ষ নবী রসুল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলেই একই শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। সেটা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহকে জীবনবিধাতা, ইলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর হুকুম দিয়ে জীবন পরিচালনা করার আহ্বান। আল্লাহর তাঁদের বহুজনকে লিখিত কেতাব দিয়েছেন। অর্থাৎ ধর্ম একটাই কিন্তু সেটা পৃথিবীতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন ভাষায় এসেছে। উপরন্তু নবীগণের বিদায়ের পর একটি ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ধর্মগ্রন্থ ও সেগুলোর শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই সকল ধর্মের মানুষকে এক পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে একজাতিতে পরিণত করে একটি জীবনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার জন্য এসেছেন আখেরি নবী মোহাম্মদ (সা.)। ইসলাম অর্ধপৃথিবী জুড়ে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে সকল ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম পালনের অধিকার লাভ করেছিল, সকলের দূরত্ব ঘুচিয়ে ঐক্য, সমন্বয় ও সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা তাদের ডিভাইড এন্ড রুল নীতির মাধ্যমে এই ভারতবর্ষে সম্প্রীতির সেই পরিবেশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। সবশেষে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে চিরস্থায়ী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। একইভাবে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে পশ্চিমা সভ্যতা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মীয় বিদ্বেষ ও উগ্রবাদকে ব্যবহার করে বিশ্বকে এক মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। বহুদেশে সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে, দেশ থেকে উৎখাত করছে। সরকারগুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে ধর্মীয় সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য। কিন্তু ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কারণে সংখ্যালঘু নির্যাতন দেশে দেশে বেড়েই চলেছে। আমরা হেযবুত তওহীদ বিশ্বনবীর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে সকল ধর্মের প্রতিনিধি ও অনুসারীদের সঙ্গে সহস্রাধিক আলোচনা অনুষ্ঠান করেছি। সেখানে আমরা সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষার মধ্যে যে অনুপম একতা রয়েছে সেটা তুলে ধরছি। এ কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে উগ্রবাদীদের দ্বারা বহু নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। এমনকি নোয়াখালীতে আমাদের নির্মাণাধীন মসজিদকে গির্জা বলে অপবাদ রটিয়ে দিয়ে সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এমনকি দুইজন সদস্যকে প্রকাশ্য দিবালোকে জবাই করে হত্যা পর্যন্ত করেছে ধর্মান্ধ উগ্রবাদ সন্ত্রাসীরা। তবু সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি সৃষ্টিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। সেখানে একটি প্রশ্ন বারবার উঠে আসে যে, সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে অভিন্ন জাতিসত্তা গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব কিনা। এ প্রশ্নের আলোকে বলতে চাই, এটা শতভাগ সম্ভব, শুধু একটি ইচ্ছা থাকতে হবে যে আমরা সবাই সকলের স্রষ্টা এক আল্লাহর হুকুম মানবো।

এই অঙ্গীকার যদি সবাই করতে পারে তবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অবশ্যই সম্ভব। আমরা যদি এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি, দেখব যে সেগুলোর মধ্যে প্রচুর যোগসূত্র রয়েছে। যেমন সকল ধর্মই বলে স্রষ্টা একজন। সকল ধর্মেই আমল দুই প্রকার- সৎকর্ম, অসৎকর্ম। সকল ধর্মেই মানুষ দুই প্রকার- মো'মেন ও কাফের, পূণ্যবান ও পাপী। একইভাবে সব ধর্মেই দুটো কালের কথা বলে- ইহকাল ও পরকাল। গন্তব্য দুটো- স্বর্গ-নরক। অধিকাংশ ধর্মই বলে সকল মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। তাঁর নাম ইসলামে আদম-হাওয়া, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মে অ্যাডাম-ইভ। একইভাবে বৈদিক ধর্মেও আমরা পাই সয়ম্ভূ মনু-শতরূপা হলেন আদি পিতা ও মাতা। আবার মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান সবাই ইব্রাহিম (আ.) কে জাতির পিতা বলে মান্য করে। সুতরাং মানবজাতি এক জাতি, এক পরিবার।

একইভাবে এক স্রষ্টার হুকুম মেনে চলাই হচ্ছে সকল ধর্মের ভিত্তি। একে আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন দীনুল কাইয়্যেমাহ (সুরা ইউসুফ ৪০)। এই দীনুল কাইয়্যেমাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে শাশ্বত, চিরন্তন, সুপ্রতিষ্ঠিত, সনাতন। হিন্দু ধর্মের মূল নামও কিন্তু সনাতন ধর্ম। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন, আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। (সুরা মুমিন ৭৮)। এ থেকে ধারণা করা যায়, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিতে ভারতবর্ষের মাটিতে আল্লাহ অবশ্যই বহু নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। সনাতন, জৈন, বৌদ্ধ ধর্মের যারা ইতিহাস ও অবতারদের জীবনের সঙ্গে কোর'আনে বর্ণিত নবী-রসুলদের জীবনের মূল শিক্ষা ও ইতিহাস মিলে যায়। সুতরাং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- আমরা সবাই এক জাতি। আমাদের ধর্মগুলো একই স্রষ্টার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো বিধান। তাই আমাদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও শত্রুতা তা অনর্থক। এখন আমরা যদি ধর্মীয় শত্রুতা ভুলে ভাই-ভাই হিসাবে মিলে মিশে থাকতে চাই তাহলে আমাদের সবার যিনি স্রষ্টা, সেই অবিভাজ্য পরম সত্তাকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে গ্রহণ করা। ইসলামের পরিভাষায় এটাই হচ্ছে তওহীদ। সমগ্র বিশ্বে আজকে যে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত তার মূলে রয়েছে স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন জড়বাদী সভ্যতা। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করব এবং স্রষ্টার হুকুমভিত্তিক একটি নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা ও সংগ্রাম করব।

দাজ্জাল: ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!

দাজ্জাল সম্পর্কে নানা ধারণা মুসলিম বিশ্বে চালু আছে। বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, আখেরি যামানায় বিরাট বাহনে চড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে; তার নাম দাজ্জাল। সে আল্লাহর বদলে নিজেকে মানবজাতির প্রভু (রব) বলে দাবী করবে। দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মতো দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। যারা তাকে প্রভু বলে মেনে নেবে তাদেরকে সে তার জান্নাতে স্থান দেবে। তার কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। যারা তাকে রব বলে মেনে নেবে তাদেরকে সে সেখান থেকে দান করবে। আর যারা তাকে রব বলে অস্বীকার করবে, অর্থাৎ তার আদেশমতো চলবে না, তাদের সে তার ভাণ্ডার থেকে দান তো করবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) ও অবরোধ (Embargo) আরোপ করবে। তার পদতলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে (বোখারী, মুসলিম)। মহানবী এই দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন, শুধু তা-ই নয়, এর মহাবিপদ থেকে তিনি নিজে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

আল্লাহর অশেষ করুণায় হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সেই দাজ্জালকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, **পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই** (Judeo-Christian Materialistic Civilization) **হচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত সেই দাজ্জাল, যে দানব প্রায় পাঁচশো বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব, কৈশোর পার হয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হয়েছে** এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত করে চলেছে; আজ মুসলিমসহ সমস্ত মানবজাতি তাকে প্রভু বলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পড়ে আছে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত, যেমন মাকাল ফল। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ করে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধ, ক্ষুধা, রক্তপাত, ক্রন্দন, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত করেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে। আর এ নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা করেছে দশ লক্ষাধিক মানুষ। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময় প্রতারক। ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা' প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে হটিয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে নিজের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। এবং মানবজাতি ইতোমধ্যেই তার সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছে। মানবরচিত সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও বাদ-ই মানুষের জীবনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী–এ মিথ্যা ও কুফরকে প্রায় সমস্ত মানবজাতি

সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। মুসলিম বলে পরিচিত এ জাতিটিও দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থাকে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান বলে মনে করছে। এভাবেই তারা দাজ্জালকে তাদের রব বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু শান্তি কি মিলেছে? না। বরং দাজ্জালকে না চিনে তার তৈরি জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে মুসলমান জাতি দাজ্জালের তৈরি জাহান্নামে পতিত হয়ে সীমাহীন অশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহর রসুলের বহু হাদিস থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে দাজ্জাল কোনো দৃশ্যমান বা শরীরী (Physical) দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদেরকে বর্তমান সভ্যতার শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি রূপক (Allegorical) বর্ণনা।

দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের মৃত্যু হচ্ছে না

দাজ্জাল প্রকৃতপক্ষেই ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা কিনা, একটি বিশেষ কারণে এটি এখন আর যুক্তি তর্কের বিষয় নেই, সকল যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। সেই কারণটি হল: বিশ্বনবী বলেছেন, "অভিশপ্ত দাজ্জালকে যারা প্রতিরোধ করবে তাদের মরতবা বদর ও ওহুদ যুদ্ধে শহীদের মরতবার সমান হবে (বোখারী ও মুসলিম)।"

রসুলাল্লাহর এ হাদিসটি এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী দাজ্জালকে চিহ্নিত করেছেন এবং হেযবুত তওহীদের সদস্যগণ দাজ্জালের পরিচয় বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছেন, এভাবে তারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করছেন। হেযবুত তওহীদ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউই দাজ্জালকে দাজ্জাল বলে চিনছে না, সুতরাং তাকে প্রতিরোধও করছে না। কাজেই বিশ্বনবীর হাদিস মোতাবেক হেযবুত তওহীদের প্রত্যেক অকপট মোজাহেদ মোজাহেদা (সদস্য-সদস্যা) জীবিত অবস্থাতেই দুই জন করে শহীদের সমান মর্যালা লাভ করবেন ইনশাল্লাহ। এটা কেবল কোনো তাত্ত্বিক বা মৌখিক দাবী নয়, এর বাস্তব প্রমাণও আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানমতে মানুষ মারা গেলে দুই ঘণ্টা পর থেকেই শক্ত হতে আরম্ভ করে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহ এক খণ্ড কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায় এবং তাপমাত্রা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দেহ এভাবে শক্ত অবস্থায় থাকে। এর পর থেকে দেহ আবার নরম হয়ে পঁচতে গলতে আরম্ভ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই শক্ত হয়ে যাওয়া। শুধু মানুষ নয়, পুরো জীবজগতে এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই, প্রত্যেক প্রাণীর দেহই মৃত্যুর পর একই ভাবে কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই শক্ত হওয়াকে বলে রিগারমর্টিস (Rigor Mortis).

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল, হেযবুত তওহীদের অনেকের ক্ষেত্রে এই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মটি কার্যকরী থাকছে না। এ আন্দোলনের অনেক মোজাহেদ-মোজাহেদাদের ইন্তেকালের পর তাদের দেহ শক্ত হয়নি, এমন কি তাপমাত্রাও

স্বাভাবিক মৃতের ন্যায় শীতল হয়ে যায়নি। একজন মোজাহেদের দেহে ইন্তেকালের ৩১ ঘণ্টা পরও মৃত্যু পরবর্তীকালীন এই স্বাভাবিক লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়নি। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন নয়, স্বাভাবিকভাবে রোগে ভুগে বা দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করলেও তাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাই ঘটছে। এমন ঘটনা একটি দু'টি নয়, অনেকগুলি হয়েছে। ঘটনা ও সাক্ষীদের স্বাক্ষরসহ বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে আছে। কেউ দেখতে চাইলে দেখানোও যাবে। এন্তেকালের পর দেহ শক্ত না হওয়ার কোনো নজির চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই। এর ব্যাখ্যা জানার জন্য আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক চিকিৎসককে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছি, মেইল করে সকল নথি-প্রমাণ পাঠিয়েছি, কিন্তু এর কোনো সদুত্তর কেউ দিতে পারেননি। এখন প্রশ্ন হল, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম এ ঘটনার ব্যাখ্যা কি?

আমাদের কাছে এর একমাত্র ব্যাখ্যা হচ্ছে, **দাজ্জাল প্রতিরোধ করার কারণে হেযবুত তওহীদের সত্যনিষ্ঠ সদস্যদেরকে মহান আল্লাহ জীবন্ত অবস্থাতেই শহীদ হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন।** আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেছেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না" (সুরা বাকারা ১৫৪)। তিনি বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে যে, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে রেযেক প্রাপ্ত" (সুরা ইমরান ১৬৯)। সুতরাং আল্লাহর কথা মোতাবেক শহীদরা হবেন জীবিত। এদিকে রসুল (সা.) বলেছেন, দাজ্জাল প্রতিরোধকারীগণ জীবন্ত অবস্থাতেই শহীদ। তাই আল্লাহ ও রসুলের কথা অনুযায়ী আখেরি যামানার দাজ্জাল প্রতিরোধকারীগণ শহীদের মর্যাদা পাবেন। আমরা মনে করি এ কারণে হেযবুত তওহীদের অনেকেই সেই মর্যাদা পাচ্ছেন যার নিদর্শনস্বরূপ তাদের দেহে মৃত্যুপরবর্তী লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয়নি এবং হচ্ছে না।

সুতরাং এ থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হেযবুত তওহীদ যাকে প্রতিরোধ করছে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা, সেটাই দাজ্জাল। সেই সাথে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হেযবুত তওহীদই সেই দল যার বিষয়ে আল্লাহর রসুল ১৪০০ বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সকলের প্রতি আহ্বান, মৃত্যুর পর রিগার মর্টিস না হওয়ার আর কোনো যৌক্তিক কারণ কারো জানা থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন।

মো'জেজাঃ হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা

ইসলামী পরিভাষায় মো'জেজা হল অলৌকিক ঘটনা (Miracle), যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সংঘটন করতে পারে না। যেমন- মৃতকে জীবিত করা, নবজাতককে দিয়ে কথা বলানো ইত্যাদি। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে এ ধরনের অলৌকিক কাজ সম্ভব নয়, এমনকি নবী-রসুলদের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে কোর'আনে মো'জেজা শব্দটি নেই। কোর'আনে অলৌকিক ঘটনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে দুটো শব্দ- আয়াত বা নিদর্শন (সুরা শু'আরা ১৫২) এবং বোরহান বা প্রমাণ (সুরা কাসাস ৩২)। আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের সত্যায়নের জন্য মো'জেজা ঘটিয়ে থাকেন।

অনেকে মনে করেন মো'জেজা বিষয়টি কেবল নবী-রসুলদের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। যেমন বাদশাহ আবরাহার বাহিনীকে আবাবিল পাখির মাধ্যমে পরাস্ত করার ঘটনাটিও একটি অলৌকিক ঘটনা বা মো'জেজা, কিন্তু এর সঙ্গে কোনো নবী-রসুল সম্পৃক্ত ছিলেন না। এটা আল্লাহ স্বয়ং ঘটিয়েছেন। অলৌকিক ঘটনা দুই রকম। একটাকে বলা হয় কারামত, অন্যটি মো'জেজা। অনেকে আবার পীর-দরবেশদের কারামতির সাথে মো'জেজাকে গুলিয়ে ফেলেন। পার্থক্য হিসেবে বলেন যে, নবীদের সাথে ঘটলে সেটা মো'জেজা, আর অন্যদের বেলায় কারামতি। আসলে কিন্তু তা নয়। মূল পার্থক্য হচ্ছে- আধ্যাত্মিক সাধকরা বিশেষ প্রক্রিয়ার (তরিকা) মাধ্যমে বহুদিন কঠোর সাধনা করে আত্মার ঘষামাজা করে অসাধারণ শক্তি অর্জন করে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন, ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেন ইত্যাদি অনেক রকম অলৌকিক কাজ করতে পারেন। এগুলো কারামত। একজন সাধককে দীর্ঘদিন কঠিন সাধনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্জন করতে হয় ওই কাজগুলো করার জন্য এবং তারপর তিনি সেটা যখন খুশি প্রদর্শন করতে পারেন। পক্ষান্তরে মো'জেজা কোনো নবীর ইচ্ছামাফিক ঘটে না এবং তার জন্য কোনো নবীকে কঠোর সাধনা বা রিয়াযতও করতে হয় না। মো'জেজা কেবল আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেমন সমুদ্র ভাগ হবার একটু আগেও মুসা (আ.) জানতেন না কীভাবে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে লোহিত সাগর পার হবেন।

এই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, সবকিছুই পরিচালিত হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে। এই আইন লঙ্ঘন করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র যিনি এই আইনের স্রষ্টা, তিনিই এখতিয়ার রাখেন আইনের ঊর্ধ্বে উঠে এমন কিছু ঘটানোর, যা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। নবী-রসুলদের সত্যতা প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন যাতে তাঁর প্রেরিত নবী-রসুলদের ব্যাপারে মানুষের কোনো সন্দেহ না থাকে এবং নবী-রসুলদেরও আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়। আর কোনো নবী-রসুল আসবেন না। নবুয়্যতের রাস্তা বন্ধ। কিন্তু আল্লাহর নিদর্শনের রাস্তা তো বন্ধ হয়নি, অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়নি। আল্লাহ এখনও

তাঁর কোনো বান্দাকে রক্ষা করার জন্য, সত্যায়ন করার জন্য, সাহায্য করার জন্য, বা মানবজাতিকে কোনো সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন। নিঃসন্দেহে তা হবে আল্লাহর মো'জেজা, তাই নয় কি?

আল্লাহর রসুল বিদায় নেওয়ার পর থেকে এই দীর্ঘ সময়ে ইসলাম বিকৃত হতে হতে এখন প্রকৃত ইসলামের আর বিকৃত কঙ্কালটি ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। এমন সময় মহান আল্লাহ অতীব দয়া করে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে সেই হারিয়ে যাওয়া ইসলামের আকিদা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বর্তমানে সারা দুনিয়ায় ইসলাম হিসাবে যে ধর্মটি চালু আছে সেটি আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত ইসলাম নয়, বরং প্রকৃত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত ইসলামটা কী তাও তিনি মানবজাতির সামনে পেশ করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, তাঁর এই কথা সত্য না অসত্য তা আমরা কী করে বুঝবো? বর্তমানে চালু থাকা হাজার হাজার ইসলামী মতবাদের ভিড়ে তাঁরটাই যে সত্য সে ব্যাপারে কী করে নিঃসন্দেহ হব? এর একমাত্র পথ - আল্লাহ যদি পূর্বের মত কোন মো'জেজা ঘটিয়ে জানিয়ে দেন সেক্ষেত্রেই আমরা তা বুঝতে পারব। কিন্তু তিনি তো নবী রসুল নন যে আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মো'জেজা ঘটাবেন, তাই এখন কোনো বিষয়কে সত্যায়ন করার প্রয়োজন হলে আল্লাহর নিজেকেই মো'জেজা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

তাই গত ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে হেযবুত তওহীদ ও তাঁর এমামকে সত্যায়ন করার জন্য আল্লাহ নিজে ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডের মধ্যে অন্তত ৯টি মো'জেজা সংঘটিত করলেন। মোবাইল ফোন যোগে মাননীয় এমামুয্যামানের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের সময় ৩১৮ জন নরনারীর উপস্থিতিতে আল্লাহ এ মো'জেজাগুলি সংঘটিত করেন। গত ১৪০০ বছরে, বিশেষ করে গত এক শতাব্দীতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। তাই এ মো'জেজার ঘটনাটিও সেই অগ্রসর বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী করেই আল্লাহ সংঘটন করেছেন। আল্লাহর এই মো'জেজা বুঝতে হলে পাঠককে অবশ্যই অভিনিবেশ সহকারে বিষয়টি অধ্যয়ন ও চিন্তা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে যার নাম "আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা"।

এই মো'জেজার মাধ্যমে আল্লাহ তিনটি বিরাট সংবাদ (নাবায়েল আযিম) মানবজাতিকে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন - (১) হেযবুত তওহীদ হক, সত্য; (২) এর এমাম হক (সত্য), (৩) হেযবুত তওহীদ দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। এই পবিত্র মো'জেজার ঘটনাটি হেযবুত তওহীদের সদস্যদের জন্য এক বিরাট প্রত্যয় ও প্রেরণার উৎস।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা

পূর্বে বলে এসেছি যে, রসুলের হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী একদেহ এক প্রাণ হয়ে সংগ্রাম করে অর্ধ পৃথিবীতে এক সোনালি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ইতিহাসের একটা পর্যায়ে যখন তারা দীন প্রতিষ্ঠান সংগ্রাম ত্যাগ করল এবং দীনের খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন তারা হাজারো ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তখন শত্রুরা সহজেই মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে সামরিক শক্তিবলে দখল করে নিল এবং তাদেরকে পদানত করে রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করল। এরই অংশ হিসাবে তারা দুই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করল - সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। এই দুটো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দুই ধরনের মনোভাব শিক্ষা দেওয়া হল যার ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ আদর্শিক ও মানসিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেল।

প্রথমেই লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সনে কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে নিজেদের মনগড়া একটি বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলামবিদ্বেষী খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা একটি সিলেবাস তৈরি করল। এখান থেকে তারা ইসলামের জাতীয় জীবনের সকল কিছু বাদ দিয়ে দিল, কারণ জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবন তো চলবে ব্রিটিশের আইন দিয়ে। তওহীদের অর্থ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতার পরিবর্তে একমাত্র উপাস্য/মাবুদ হিসাবে মানার শিক্ষা দিল। দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদকেও সিলেবাস থেকে বাদ দিল। শুধু ব্যক্তিগত আমলের খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া-কালাম, মিলাদের নাত, বিশেষ করে বিভিন্ন মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল যেন সেগুলো নিয়ে মুসলিমরা তর্ক, বাহাস, মারামারিতে লিপ্ত থাকে। একে একে ২৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত সেখানে অধ্যক্ষপদে থেকে ১৪৬ বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলামটি শিখিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ইয়াকুব শরীফ লিখেছেন, "মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল।" [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ]।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি কর্মমুখী (Vocational) কোনো কিছুই রাখা হল না। ফলে মাদ্রাসাশিক্ষিতরা এক প্রকার বাধ্য হলেন নামাজের ইমামতি, ওয়াজ, মিলাদ, কোর'আন খতম, বিয়ে ও জানাজা পড়ানো ইত্যাদি কাজ করাকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে। অথচ দীনের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। জীবিকার স্বার্থে এই মহাসত্যকে তারা গোপন করে খ্রিষ্টানদের তৈরি ঐ বিকৃত বিপরীতমুখী ইসলামটাই প্রচার করে সমগ্র মুসলিম জাতির মধ্যে গেড়ে দিলেন।

আলেমদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে এত যে দ্বন্দ্ব তার কারণ মাদ্রাসার সিলেবাসের মধ্যেই নিহিত।

মাদ্রাসার পাশাপাশি ইংরেজ শাসকদের দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতা করার জন্য ব্রিটিশরা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল। সেখানে দীন সম্পর্কে প্রায় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হল না। বরং সুদভিত্তিক অংক, ব্রিটিশ রাজা-রানির ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন ইত্যাদি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে একটা বিদ্বেষভাব (অ যড়ংঃরষব ধঃঃরঃঁফব) শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করানো হল। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দুনিয়ামুখী, বস্তুবাদী একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠল যাদের হাতে দেশ চালনার দায়িত্ব দিয়ে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল। সেই কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা আজও চলছে এবং সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ কথিত আধুনিক ও শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন যাদের দু চারজন বাদে সকলেই চরম আত্মকেন্দ্রিক, যারা নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। এদের অধিকাংশই ধর্মকে মনে করেন সেকেলে ধ্যানধারণা ও পৌরাণিক কল্পকাহিনী। এ যুগে ধর্ম অচল। তাদেরকে শেখানো হল আধুনিক সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চিমাদের উদ্ভাবন। কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি যে মুসলিমরাই নির্মাণ করেছিল সেটা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হল না। এদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় বা আল্লাহর হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকায় এরা সরকারি দায়িত্ব পেয়ে সীমাহীন দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ পাচার ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত হতে কোনো প্রকার বিবেকের দংশন অনুভব করেন না।

এই দুইপ্রকার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষিতজনেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষিতরা মনে করছেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা জাহান্নামে যাবে আর সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা তাদেরকে কাঠমোল্লা, দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর, অজ্ঞ বলে চরম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। একই জাতির মধ্যে এই যে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব - এর মূল কারণ এই ষড়যন্ত্রমূলক জাতিবিনাশী শিক্ষাব্যবস্থা। এটি দূর করার জন্য আমাদেরকে অত্যন্ত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নিজেদের জাতির লক্ষ্য মোতাবেক একটি একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে একদিকে বস্তুগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ করবে অন্যদিকে তাদেরকে নৈতিকভাবে চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ, মানবিক, সত্যবাদী মো'মেন হিসাবে গড়ে তুলবে। এ লক্ষ্যে আমরা হেযবুত তওহীদ ইতোমধ্যে নোয়াখালীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি যা সমগ্র জেলায় সকল বিষয়ে সুনাম সুখ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠা

উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী পন্নী বংশীয় জমিদার পরিবারের সন্তান এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯৯৫ সালে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সনে যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। বুদ্ধি হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পান সমস্ত মুসলিম জগৎ কোনো না কোনো পাশ্চাত্য প্রভুর গোলাম। অথচ মুসলিমরাই এক সময় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক, অর্থনৈতিক শক্তিতে সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ তাদের এই করুণ পরিণতি কেন? একটু একটু করে, সারা জীবন ধরে তিনি তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকলেন। জীবনের পরিণত বয়সে এসে তিনি বুঝতে পারলেন কী সেই শুভঙ্করের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা, তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বুঝলেন, চৌদ্দশ বছর আগে মহানবী (সা.) যে দীনকে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে দীনটি আর আজ আমরা 'ইসলাম ধর্ম' বলে যে দীনটি অনুসরণ করি এ দু'টি দীন পরস্পর-বিরোধী, বিপরীতমুখী দু'টো ইসলাম। ফলে রসুলের নিজ হাতে গড়া জাতিটি এবং বর্তমানের মুসলিম জনসংখ্যাটিও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ইসলামের সঠিক আকিদা, তওহীদের মর্মবাণী, এবাদতের অর্থ, মো'মেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী হবার শর্ত, হেদায়াহ-তাকওয়ার পার্থক্য, সালাতের (নামাজের) সঠিক উদ্দেশ্য, দাজ্জালের পরিচয়, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা, পাঁচ দফা কমসূচি এবং কীভাবে তাকে প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদিসহ আরো বহু বিষয় তিনি আল্লাহর দয়ায় বুঝতে পারলেন। মানবজাতিকে তিনি আবারও আল্লাহর তওহীদের উপরে ঐক্যবদ্ধ করে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৫ সনে 'হেযবুত তওহীদ' আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। এ আন্দোলনের কর্মসূচি আল্লাহর দেওয়া কর্মসূচি যা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদ লক্ষ লক্ষ সভা সেমিনার, আলোচনা সভা, ঘরোয়া মিটিং, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পত্রিকা প্রকাশ, বই হ্যান্ডবিল পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থার ব্যর্থতা ও আল্লাহর তৈরি জীবনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরছে। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সামাজিক অবস্থানকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সারাদেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে উগ্রবাদী ধর্মান্ধ শ্রেণী। ফলে একাধিকবার তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে গ্রেফতারও করা হয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে হেযবুত তওহীদ নিরন্তরভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হাজার বছরের ফিকাহ, তাফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ-সরল (সিরাতুল মুস্তাকিম) ইসলাম চাপা পড়ে রয়েছে সে ইসলামকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার করে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে।

চেইন অব কমান্ডঃ বর্তমান এমাম

পরিবার থেকে সরকার যে কোনো সংগঠনের একজন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ থাকতেই হবে যার সিদ্ধান্তকে সবাই চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে। উম্মাহর এই কর্তৃপক্ষকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'ইমাম' বা নেতা। সকল নবী-রসুলগণও তাঁদের স্ব স্ব উম্মাহর ইমাম ছিলেন। আল্লাহ বলেন, স্মরণ কর, যেদিন (হাশরের দিন) আমি প্রত্যেক কওমকে তাদের ইমামসহ আহ্বান করব। (বনী ইসরাইল ৭১)।

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ (Conformed to Natural Law)। নেতা ছাড়া কখনোই দুজন ব্যক্তির মধ্যেও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব নয়। তাই ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, দুজন মানুষই হোক বা দু লক্ষ মানুষই হোক, তারা জামাতে নামাজ পড়লে একজন ব্যক্তিকেই ইমাম মানতে হয়। নামাজের উদ্দেশ্য কেবল দোয়া বা প্রার্থনা করা নয়, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল জাতিকে ইমামের নিঃশর্ত আনুগত্যের চর্চা করানো। মুসল্লিদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, নামাজে যেমন তারা ইমামের আনুগত্য করছে, বাস্তব জীবনেও তাদেরকে ইমামের আনুগত্য করতে হবে। এই আনুগত্যের শপথকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয়- বায়াত (Promise of Obedience)। রসুলাল্লাহ এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'যে ব্যক্তি ইমামের প্রতি আনুগত্যের শপথ ছাড়া (বায়াতহীন) মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।' (মুসলিম- ১৮৫১)।

ইসলামের চেইন অব কমান্ড মোতাবেক, ইমামের পরে থাকেন আমির আর আমিরের অধীনে থাকেন মো'মেন-মোজাহেদগণ। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ পালন কর, রসুলের আদেশ পালন কর, আর তোমাদের মধ্যে যারা আমির (আদেশ দানকারী, উলিল আমর) তাদের আদেশ পালন কর। (সুরা নিসা ৪:৫৯)। আমিরের আদেশ মান্য করার বিষয়ে রসুলাল্লাহ বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, যদি কোনো বিকলাঙ্গ, কুৎসিত, কানকাটা, হাবশি গোলামকেও তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয়, আর সে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালিত করে, তাহলে অবশ্যই তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। (উম্মুল হুসায়ন রা. থেকে মুসলিম ১২৯৮)।

হেযবুত তওহীদ কোনো ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন নয়, এটি আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। তাই এখানে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব কাঠামো বা চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হচ্ছেন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমাম। তিনি আন্দোলনের পরিচালনার জন্য তাঁর সার্বক্ষণিক সহকারী জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমকে আমিরের (সমন্বয়কারী) দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর অধীনে বিভিন্ন জেলায় আমির নিয়োগ করা হয়। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠাতা এমামের ইন্তেকালের পর সর্বসম্মতিক্রমে আন্দোলনের এমাম মনোনীত হন জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। সকল সদস্য লিখিত ফরমে স্বাক্ষর করে তাঁর বায়াত গ্রহণ করেন।

আমরা মনে করি, হেযবুত তওহীদের এমাম আল্লাহর মনোনীত। তিনি আন্দোলনের সদস্যদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের নেতা হিসেবে বিবেচিত হন। আন্দোলনের কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ায় তিনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে রয়েছে: প্রচার বিভাগ, তথ্য বিভাগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা বিভাগ, আইনী সহায়তা বিভাগ, নারী বিভাগ, সাহিত্য ও গবেষণা বিভাগ, নিরাপত্তা বিভাগ, রাজনৈতিক যোগাযোগ বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিভাগ ইত্যাদি। এই ডিপার্টমেন্টগুলোর পরিচালক ও প্রধান আমিরদের নিয়ে মাননীয় এমাম একটি কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি করেন। কার্যক্রম নির্বাহের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তবে সাংগঠনিক কার্যক্রমে সকল সদস্য শাখা আমিরের নির্দেশ মেনে চলে।

এক নজরে হেযবুত তওহীদের সংগঠন কাঠামো হচ্ছে এমন:

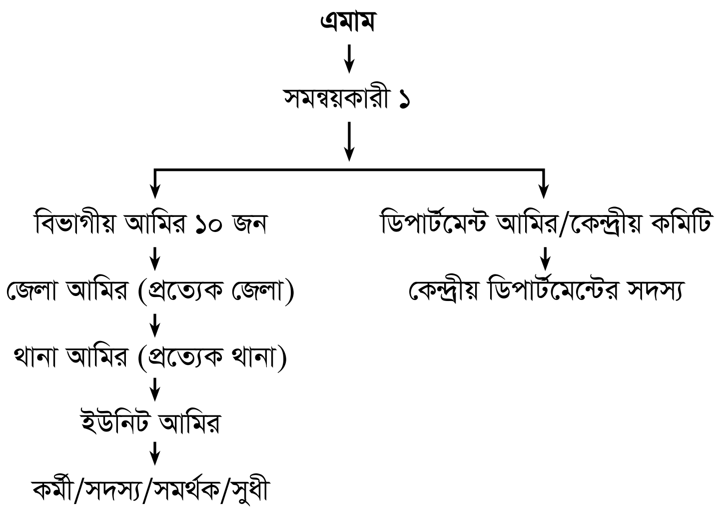

যোগদানের শর্তাবলি ও আন্দোলনের নীতিমালা

কোনো মানুষ যদি জ্ঞান দ্বারা এ সত্যটি বুঝতে পারেন এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন যে, একমাত্র আল্লাহর তওহীদ মানুষকে জান্নাতে নিতে পারে এবং তওহীদভিত্তিক সত্যদীন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই মানবজীবনে শান্তি আনতে পারে, তখন তিনি এ আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন। যোগদানের সময় অবশ্যই তিনি কারো দ্বারা প্ররোচিত বা প্রভাবিত হবেন না বা কোনো প্রলোভনের শিকার হবেন না। নিজের বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি কাজে লাগাবেন। কারণ আল্লাহ বলেছেন, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তার অনুসরণ করবে না (সুরা বনি ইসরাইল ৩৬)। তারপর নির্দিষ্ট অঙ্গীকারপত্র পূরণ করে তিনি আন্দোলনে যোগদান করবেন। অঙ্গীকারপত্রটি আল্লাহ প্রদত্ত ও রসুল বর্ণিত পাঁচদফা কর্মসূচির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। যোগদানের পর সকলতে কয়েকটি বিষয় পালন করতে হবে। যেমন:

» প্রচলিত কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।

» অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, দেশের আইন ভঙ্গ হয় এমন কিছু করা যাবে না।

» ধর্মীয় কাজ করে কেউ কোনোরূপ স্বার্থ হাসিল বা বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না, বিনিময় নিবে আল্লাহর কাছ থেকে। কারণ আল্লাহ তাদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন দীনের বিনিময় গ্রহণ করে না। (সুরা ইয়াসিন ৩৬:২১)।

» কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না। সকলে হালাল উপায়ে উপার্জন করবে এবং উপার্জন থেকে আল্লাহর রাস্তায় দান করবে।

» প্রত্যেকের আমির থাকবে। আমিরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

» আন্দোলনের ভিতরে ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কথা বলা যাবে না, কাজও করা যাবে না।

» আন্দোলনের কোনো গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

» কোনো শ্রেণিবৈষম্য করা যাবে না। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-নিরক্ষর, ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে কাজ করবে।

» যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য বা সমর্থক নয় তাদের কাছ থেকে আন্দোলন পরিচালনার কাজে কোনো অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

» কেউ অন্য কোনো ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না এবং অন্য কোনো ধর্মের প্রবর্তক, অবতার, ধর্মগুরু, ধর্মগ্রন্থ বা উপাসনালয়ের সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করবে না।

পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকার

যারা হেযবুত তওহীদের সকল নীতিমালা মান্য করবেন এবং আন্দোলনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন তাদের প্রতি আমাদের আন্দোলনের সকলের পক্ষ থেকেও কিছু অঙ্গীকার রয়েছে, যেগুলো পূরণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। কারণ আল্লাহ বলেছেন, মো'মেনরা পরস্পর ভাই-ভাই (সুরা হুজরাত ১০)। মহানবী (সা.) বলেছেন, সমগ্র মো'মেন একটি দেহের ন্যায় যার এক অঙ্গে আঘাত পেলে সমস্ত দেহ পীড়িত হয় (মুসলিম)। কাজেই এক মো'মেন আরেক মো'মেনের উপর ঈমানি কর্তব্যবোধ থেকে আমরা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

০১. কেউ খাদ্যের অভাবে মারা যাবে না।

০২. কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না।

০৩. কেউ বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাবে না।

০৪. কেউ বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পাবে না।

০৫. কেউ জীবনের জন্য অপরিহার্য শিক্ষা ও জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ বিগত ৩০ বছরে হেযবুত তওহীদের একজন সদস্যকেও খাদ্যের অভাবে থাকতে হয়নি বা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। শিক্ষার আলো থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে আমরা দীনি শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও প্রযুক্তি শিক্ষার সমন্বয়ে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করেছি।

আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত

যে কোনো আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। হেযবুত তওহীদ আন্দোলন যখন গঠন করা হয় তখন এ বিষয়টি সামনে আসে যে, আন্দোলন পরিচালনার অর্থ কোথা থেকে আসবে। এজন্য প্রথম দিকে চিন্তা করা হয়েছিল যে সাধারণ মানুষের থেকে চাঁদা তুলে ইসলাম প্রচারের জন্য কাজ করা হবে। কিন্তু মাননীয় এমামুয্যামান ভাবলেন যে, বহু মানুষের হারাম উপার্জনের টাকাও থাকতে পারে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজ তো হারাম টাকা দিয়ে হবে না। সেটা হতে হবে মো'মেনদের হালাল রাস্তায় উপার্জিত অর্থে। তাই তিনি শুরু থেকেই এই নীতি ঠিক করে দেন যে, হেযবুত তওহীদের সদস্য নয় এমন কারো থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। সেই থেকে আন্দোলনের দরিদ্র থেকে দরিদ্র সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কষ্টার্জিত রোজগার থেকে যে অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন সেটা দিয়েই আন্দোলনের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী বিক্রয় করেও কিছু অর্থ আন্দোলনে আসে।

ব্যয়ের খাতঃ আন্দোলনের তহবিল সাধারণত বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ (১) দেশের বিভিন্ন স্থানে অফিস ভাড়া, যাতায়াত, যোগাযোগ রক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন, অফিসের কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামত; (২) আন্দোলনের প্রচার কার্যক্রমে ব্যবহৃত বই, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি প্রকাশনা খরচ; (৩) সভা, সেমিনার, সমাবেশ, র‍্যালি ও ঘরোয়া বৈঠক আয়োজনের জন্য খরচ; (৪) মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা এবং প্রতিপক্ষের দ্বারা হয়রানির শিকার সদস্যদের সহায়তা; (৫) দরিদ্র ও অভাবীদের সহায়তা এবং চিকিৎসাসেবা প্রদান; (৬) মসজিদ নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি।

হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কারা করে, কেন করে?

প্রত্যেক আদর্শেরই পাল্টা আদর্শ ও আদর্শিক প্রতিপক্ষ থাকতেই পারে। সভ্য সমাজে আশা করা হয়, এ ধরনের প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধমতের গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। আমাদের বিরুদ্ধে দুটি শ্রেণির প্রতিপক্ষ আদর্শিক সমালোচনা না করে ডাহা মিথ্যা, গুজব এবং ভিত্তিহীন তথ্য প্রচার করে যাচ্ছে। এই শ্রেণি দুটি হল: এক) ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি এবং দুই) ইসলামবিদ্বেষী শ্রেণি।

ধর্মব্যবসায়ীরা কেন অপপ্রচার করে? আমাদের বিরুদ্ধে তাদের এই শত্রুতার প্রধান দুটি কারণ-

১) অহংকারে আঘাত: তাদের অহংকারে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তারা মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে আলেম হয়েছেন। তারা তাই নিজেদেরকে নায়েবে নবী ও দীনের কর্তৃপক্ষ বলে বিশ্বাস করেন। এখন আমরা সাধারণ মানুষ যখন দীনের কথা বলছি, তখন সেটা তাদের অহংকারে লাগছে।

২) আর্থিক স্বার্থে আঘাত: তারা ইসলামকে ব্যবহার করে রুজি-রোজগার করছেন, ইসলামকে জীবিকায় পরিণত করেছেন। কিন্তু আমরা এ মহাসত্যটি তুলে ধরেছি যে, আল্লাহর দীনের বিনিময় নেওয়া আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যারা বিনিময় নেয় তাদেরকে অনুসরণ করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন (সুরা বাকারা ১৭৪, সুরা ইয়াসিন ২১)। অর্থাৎ এক কথায় ধর্মের কাজের বিনিময়ে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা আমাদের কথা নয়, একটা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথা, আমরা শুধুমাত্র তুলে ধরেছি।

আমাদের এই বক্তব্যে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটির স্বার্থে আঘাত লেগেছে। ফলে তারা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। তারা হাটে বাজারে, মাদ্রাসা মসজিদে, ওয়াজ মাহফিলে, জুমার খুতবায়, অনলাইনে আমাদের বিরুদ্ধ ডাহা মিথ্যা কথা প্রচার করে যাচ্ছে, আমাদেরকে খ্রিষ্টান, কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক, ইসলামের শত্রু, ইহুদির দালাল বলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করছে ও হুমকি দিচ্ছে। এডিট করে অনলাইনে আপত্তিকর ছবি ভাইরাল করা হয়েছে। যেমন দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার সংবাদে ভারতের কেরালা রাজ্যের একটি মসজিদে একজন নারীকে ইমামতি করতে দেখা যায়। কেউ একজন মুসল্লির ছবি এডিট করে সেখানে মাননীয় এমামের চেহারা বসিয়ে দেয় আর অপপ্রচার চালায় যে হেযবুত তওহীদে নারীরা নামাজের ইমামতি করে। অগণিত মানুষ সেটা বিশ্বাস করে এবং প্রচার করে। শুধু অপপ্রচারের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেনি, তারা গত ৩০ বছরে অন্তত পাঁচ শতাধিকবার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে হামলা চালিয়ে আমাদের বাড়িঘরে হামলা করেছে, বহু সদস্যকে পৈত্রিক ভিটা থেকে উৎখাত করেছে, শত শত সদস্যকে আহত রক্তাক্ত করেছে, পাঁচ জনকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছে। অপরদিকে হাজারো সত্যনিষ্ঠ, হক্কানি আলেম আমাদের কাজকে সমর্থন দিচ্ছেন, দোয়া ও সহযোগিতা করছেন।

ধর্মবিদ্বেষীরা কেন অপপ্রচার করে?

উপরে বলে এসেছি যে ব্রিটিশ খ্রিষ্টানরা তাদের তৈরি করা সাধারণ ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে গৌণ ও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে শিক্ষা দিয়েছে। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের অধিকাংশই ধর্মের বিষয়ে চরম অবজ্ঞা পোষণ করেন এবং একে অকল্যাণকর মনে করেন। এই শ্রেণিটির হাতেই মুসলিম বিশ্বের দেশচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, বিশেষ করে গণমাধ্যমগুলোর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে। যেহেতু আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার প্রতি তাদের মনোভাব শত্রুভাবাপন্ন, তাই তারা আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথম অন্তত ২০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে গেছেন। তারা হাজার হাজার মিথ্যা রিপোর্ট আমাদের বিরুদ্ধে লিখেছেন যেগুলোতে তারা হেযবুত তওহীদকে একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত, কালো তালিকাভুক্ত জঙ্গি, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী সংগঠন ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। গত শতাব্দীতে জার্মানির চ্যান্সেলর এডলফ্ হিটলারের জনসংযোগ ও প্রচারমন্ত্রী ভন গোয়েবলসের নীতি ছিল এই যে যদি একটা মিথ্যাকে ক্রমাগত একশ’ বার বলে যাও তবে সেটা মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করবে। পশ্চিমা সভ্যতা তার এই নীতিকে গ্রহণ করে নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বময় অপপ্রচার ছড়াচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী জাতি হিসাবে চিত্রিত করে যাচ্ছে। পশ্চিমা ভাবধারার অনুসারী এক শ্রেণির দেশীয় মিডিয়াগুলোও বাংলাদেশে সক্রিয় কতিপয় জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে হেযবুত তওহীদকেও এক কাতারে ফেলে বানেয়াট সংবাদ প্রচার করতে থাকে। সেগুলোর প্রতিবাদ জানালেও সেটা তারা প্রকাশ করে না। কারণ আমাদের দলের নাম আরবিতে রাখা হয়েছে, আমরা ইসলামকে জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখতে চাই যা তাদের কাছে অসহ্য, তারা কিছুতেই তা চান না। তাদের এই অবিশ্রান্ত মিথ্যাচারের ফলে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় বহু কর্মকর্তা মিডিয়ার এসব মিথ্যা সংবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে আমাদের সদস্যরা প্রচারকাজ করতে গিয়ে অগণিতবার গ্রেফতার হন এবং অন্তত পাঁচ শতাধিক মিথ্যা মামলার শিকার হন।

আলহামদুল্লিাহ, গত দশ বছরে আমরা মিডিয়া, প্রশাসনসহ দেশের অন্যান্য দায়িত্বশীল পর্যায়ে যারা আছেন তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে হেযবুত তওহীদ কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, বরং আইনমান্য করায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই আন্দোলন। তবে এখনও বহু মানুষ সেই অপপ্রচারের কারণে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। আর ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীটি এখনও তাদের ওয়াজে, খোতবায় হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে বানোয়াট মিথ্যা কথা প্রচার করেই যাচ্ছে। তাই সকলের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে, আমাদের বিষয়ে কোথাও নেতিবাচক কোনো কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের বই পড়ুন, অনলাইনে আমাদের বক্তব্য দেখুন। তৃতীয় পক্ষের কথাকে আমাদের কথা বলে গ্রহণ করবেন না।

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

মানুষের জীবনের সর্ব অঙ্গনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ আসলেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তারা হচ্ছে সেই অংশটি যারা কিছুতেই জাতীয় জীবনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হোক তা চান না। যারাই আল্লাহর দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠার কথা বলে, এই শ্রেণিটি তাদের সবাইকে এক পাল্লায় ফেলে তাদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি বলে প্রচার করে মানুষের কাছে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। ইসলামে জেহাদ, কেতালের যে আলোচনা রয়েছে সেটাকেই তারা সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বলে, লিখে, বক্তৃতা করে, যুক্তি উপস্থাপন করে, বুঝিয়ে ইত্যাদি সবই জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী ইত্যাদির পর্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোর'আন-হাদিস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা করে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে নিরংকুশ শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের মধ্যে বাস করতে হলে একমাত্র পথ- যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। এই কাজ কি জোর করে করাবার কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর করে, শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

হেযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংকল্প করেছে এবং করছে মানুষকে বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে। প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরাই হচ্ছে বিকৃত ইসলামের কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করার একমাত্র পথ। হেযবুত তওহীদ তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান করছে এবং জঙ্গিবাদের ভ্রান্তিগুলো রসুলের জীবন থেকে, কোর'আন হাদিস থেকে তুলে ধরছে। এই সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজটি করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে আল্লাহর রসুলের প্রক্রিয়া। তিনি কী করেছিলেন? মক্কী জীবনের তের বছর তাঁর আহ্বান অর্থাৎ বালাগ ছিল ব্যক্তি ও দলগত পর্যায়ে। তাই তিনি ও তাঁর দল সর্বপ্রকার অত্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, নির্যাতন সহ্য করেছেন– কোনো প্রতিঘাত করেননি। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরাও আজ ৩০ বছর ধরে মানুষকে তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান জানিয়ে আসছে, এটা করতে যেয়ে তারা বিরুদ্ধবাদীদের গালাগালি খাচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, এমনকি আমাদের পাঁচজন সদস্য শহীদ হয়েছেন।

আল্লাহর রসুলের তের বছরের মক্কী জীবনও ছিল শুধু এক তরফা নির্যাতন। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ করল, তখন তিনি হিজরত করে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র গঠন করলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন করলেন তখনই নীতি বদলে

গেল। কারণ রাষ্ট্র কোনোদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না। তিনি যখন মদিনাবাসীর অবিসংবাদিত নেতা হলেন তখন তাঁকে বিচারক হিসাবে বিবাদের মীমাংসা করতে হল, অপরাধীদের বিচার করতে হল, শাসক হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনিক দপ্তর (মসজিদ) প্রতিষ্ঠা করতে হল, সেখানে প্রশাসক নিয়োগ দিতে হল। আল্লাহর রসুল হিসাবে তিনি তাদেরকে কোর'আন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের আত্মিক ও শারীরিক উপযুক্ততা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। ভূখণ্ডের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার জন্য তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। নবগঠিত রাষ্ট্রের সেনাপ্রধান হিসাবে আল্লাহর রসুলও প্রয়োজনীয় সামরিক পদক্ষেপ নিলেন। তিনি অপরাপর রাষ্ট্রনায়কদের মতোই জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ করলেন, প্রয়োজনে সন্ধি করলেন। এগুলো সবই করলেন যখন তাঁর হাতে একটি জাতি তাদেরকে পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল তারপর অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পর। সুতরাং রসুলাল্লাহর প্রদর্শিত পথ মোতাবেক তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলগতভাবে কোনো কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই, আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইনসম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনি, সন্ত্রাসী। কোর'আন ও হাদিসে যে জেহাদ ও কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত। বিভিন্ন সময়ে যেসব মুফতিরা ইসলামবিদ্বেষীদেরকে হত্যার ফতোয়া দিচ্ছেন আর যারা চাপাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই হত্যাকে রসুলাল্লাহর করা সামরিক অভিযানের সঙ্গে এক করে দেখাতে চাচ্ছে তারা কি এই দণ্ড প্রদানের জন্য জাতি কর্তৃক মনোনীত বিচারক, নাকি গায়ে মানে না আপনি মোড়ল? বিচারক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া দূরের কথা জাতি যাদেরকে চেনেই না, তারা কোন অধিকারে, কোন ক্ষমতাবলে অপরকে কতলের রায় প্রদান করছেন? তারা কি মাদ্রাসায় কিছু মাসলা মাসায়েল শিখে নিজেদেরকে নিজেরাই রাষ্ট্রের 'কাজী' বলে সাব্যস্ত করছেন?

আমরা কোর'আন-হাদিস দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবনব্যবস্থা ছাড়া মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীই তার প্রমাণ। এখানে জোর জবরদস্তির কোনো স্থান নেই, মানুষকে জোর করে কোনো কিছু বোঝানো যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান। মানুষ যদি একে গ্রহণ করে তবে দেশে তওহীদ ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা পার্থিব ও পরকাল দুই জীবনে শান্তি ও গৌরবের অধিকারী হবে। আর যদি মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তবে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহর যা ইচ্ছা করবেন। তবে প্রচলিত সিস্টেমের ধারক-বাহক-অনুসারীরা আমাদের যতই বিরোধিতা করুক, আল্লাহর সত্যদীনকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে।

প্রতিষ্ঠাতা এমামের পরিচয়

হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর এমন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান যাদের রয়েছে হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন আফগান বংশীয় বাংলার স্বাধীন সুলতান যাদের শাসনামলকে 'কররানি যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁরই পূর্বপুরুষ সুলতান দাউদ খান কররানি ১৫৭৬ সনে বাংলায় মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাজমহলের যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরীরা মুঘল যুগে আটিয়া পরগনার প্রশাসক হন এবং ব্রিটিশ যুগে করটিয়ার জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন যে পরিবার বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার, রাজনীতি, ধর্মপ্রচার, সংস্কৃতির লালন, মুসলিম রেনেসাঁয় সর্বোপরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিপুল অবদান রেখেছে।

এমায্‌যামানের পিতৃনিবাস টাঙ্গাইলের করটিয়া জমিদারবাড়ি। জন্ম ১৫ শাবান ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ। শৈশব কাটে নিজ গ্রামে। এইচ. এম. ইনস্টিটিউশন থেকে তিনি ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে এবং বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন।

এখানে শিক্ষালাভের সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগঠন তেহরিক ই খাকসারে যোগদান করেন এবং নিজ সহজাত নেতৃত্ব ও যোগ্যতাবলে সংগঠনের নেতৃ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নীত হন। সেই সুবাদে তিনি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের কিংবদন্তিতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু ঘোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মওলানা আবুল আলা মওদুদী, আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকি অন্যতম। শিকারের নেশা তাঁর রক্তে মিশে ছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে হিংস্র পশু শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশোনা করেন। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছ থেকে। ১৯৬৩ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এম.পি. নির্বাচিত হন। এমপি হিসাবে তিনি নিজ এলাকার শিক্ষা, চিকিৎসা, সড়কব্যবস্থাসহ সকল প্রকার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

ছোটবেলায় মুসলিম জাতির অতীত গৌরব আর বর্তমানের অবস্থার মধ্যে তিনি বিরাট পার্থক্য লক্ষ করে এর কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। ধীরে ধীরে তিনি আল্লাহর দয়ায় বুঝতে পারেন যে, কীসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হয়েছিল, আর কীসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা?

সেটা হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত আকিদা। ১৯৯৫ সনে তিনি ইসলামের প্রকৃত রূপটি মানবজাতির সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। সত্য প্রচার করতে গিয়ে তিনি নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। ১৬ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে এ মহান ব্যক্তিত্ব পরলোকগমন করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

০১. **সাহিত্যকর্ম:** তাঁর সতেরো বছরের গবেষণার ফসল 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি ১৯৯৬ সনে প্রকাশের পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর লেখা "দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!" বইটি ২০০৮ সনে বেস্টসেলার হয়। তাঁর শিকারী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা "বাঘ-বন-বন্দুক" বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

০২. **চিকিৎসা:** বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

০৩. **শিকার:** বহু হিংস্র প্রাণী শিকার করেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

০৪. **ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম:** তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের তরুণ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর 'তেহরীক এ খাকসার' আন্দোলনের পূর্ব বাংলা কমান্ডার এবং 'সালার এ খাস হিন্দ' পদের অধিকারী হয়েছিলেন।

০৫. **রায়ফেল শুটিং:** ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

০৬. **রাজনীতি:** পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩–৬৫)।

০৭. **সমাজসেবা:** হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

০৮. **শিল্প সংস্কৃতি:** নজরুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

হেযবুত তওহীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল শান্তিময় সভ্যতা নির্মাণের দৃষ্টান্ত হিসেবে হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম নিজ গ্রাম নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার পোরকরাকে মডেল গ্রাম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিছুদিন আগেও গ্রামটি ছিল অজ পাড়া গাঁ যেখানে মাদক, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। অথচ বর্তমানে এটি একটি উপশহরে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। হেযবুত তওহীদের সদস্যরা এখানে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন এবং অর্ধশতাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাবাসীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন করছেন।

(১) শহীদী জামে মসজিদ: মাননীয় এমামের বাড়ির আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত চারতলাবিশিষ্ট শহীদী জামে মসজিদ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। ২০১৬ সালে উগ্রবাদী গোষ্ঠী এটিকে গির্জা বলে গুজব রটিয়ে গুড়িয়ে দেয় এবং দুজন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বর্তমানে প্রতি জুমায় এখানে হাজারো মুসল্লি সমবেত হন। মসজিদে মক্তব, গণশিক্ষা কার্যক্রম এবং পাঠাগার রয়েছে। দেশের অধিকাংশ মসজিদে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও এখানে তারা নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিয়েশাদি, আকিকা, সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংবাদিক সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জুম'আর পর মাননীয় এমাম মুসল্লিদের ব্যক্তিগত অবস্থার খোঁজ নেন এবং সমস্যা থাকলে তার সমাধান করেন।

(২) চাষীরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়: বস্তুগত জ্ঞান ও নৈতিক চরিত্রে সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তুলতে হেযবুত তওহীদ একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তাব করছে যার চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চাষীরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়। ইতোমধ্যে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও অন্যান্য অঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

(৩) কৃষি প্রকল্প: জাতির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাষীরহাটে বহুসংখ্যক কৃষি প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে এসব প্রকল্পে ধান, ভুট্টা, পাট, গম ইত্যাদি ফসল ছাড়াও নানাপ্রকার ফলমূল, শাক-সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পে শত শত মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

(৪) মৎস্য চাষ প্রকল্প: এখানে বর্তমানে নয়টি ৯ টি পুকুর খনন ও সংস্কার করে মাছ চাষ করা হচ্ছে, যার মোট আয়তন প্রায় ২০ একর। এসব পুকুরে বছরে দুশো টনের বেশি মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে মৎস্য প্রজনন প্রকল্প যা ইতোমধ্যেই অধিক ডিম ও পোনা উৎপদনের জন্য সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের পুরস্কার লাভ করেছে।

(৫) পোশাক শিল্প কারখানা: এখানে স্থাপিত তৈরি পোশাক কারখানা কররানি ফ্যাশনস-এ কর্মরত আছেন তিন শতাধিক নারী পুরুষ। এখানে বাচ্চাদের পোশাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষের পোশাক, মশারি ইত্যাদি উৎপাদন করা হচ্ছে।

(৬) গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প: দুধ ও মাংসজাত আমিষের চাহিদা পুরণের জন্য এম এম এগ্রো ফার্ম নামে চাষীরহাটে তিনটি গরুর খামার স্থাপন করা হয়েছে। বছরে এসব খামার থেকে পাঁচ শতাধিক গরুকে স্টেরয়েড প্রয়োগ না করে পুরোপুরি অর্গানিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যবান ও হৃষ্টপুষ্ট করে বিক্রি করা হয়। গরুর খাওয়ার জন্য প্রায় ২০ একর জমিতে উন্নতজাতের ঘাসের চাষ করা হয়। দানাদার গোখাদ্য ও ভুট্টার সাইলেজ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়। ফলে এই খামারের গরুর মাংস সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর।

(৭) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান: এখানে কররানি ব্র্যান্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যা সরিষার তেল, লাল আটা, গুড়া মসলা, সাবান, ডিটার্জেন্ট, মশার কয়েলসহ ৮০টির বেশি পণ্য উৎপাদন করছে।

(৮) তাঁতশিল্প: এখানে স্থাপন করা হয়েছে একটি তাঁত শিল্প কারখানা যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যবাহী বয়নশৈলী মিশিয়ে শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গামছা, টেবিলক্লথ, বিছানার চাদর ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

(৯) হাসপাতাল: নোয়াখালীর প্রত্যন্ত জনপদে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে চলছে হেযবুত তওহীদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **তওসেলিমুস** ক্লিনিক। এতে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাপদ্ধতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

(১০) আবাসন প্রকল্প: চাষীরহাট উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের আবাসনের জন্য সেখানে প্রতিনিয়ত সেখানে চলছে ভবন নির্মাণ। ইতোমধ্যে স্থাপিত আবাসন প্রকল্প 'মেম্বার কলোনিতে' ৫০ টি পরিবার বাস করতে পারছে।

(১১) ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রকল্প: বেকার যুবকদের সাবলম্বী করে তোলার জন্য এখানে অর্ধশতাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

(১২) বাণিজ্য মেলা: চাষিরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতি বছর সপ্তাহব্যাপী বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে আমাদের প্রকল্পসমূহে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রি করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয় এই মেলায়। তারা মেলার অনবদ্য শৃঙ্খলা, উৎসবমুখর পরিবেশ, অটুট নিরাপত্তা ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তুষ্ট হন।

নোয়াখালী ছাড়াও দেশের অন্যান্য অর্ধশতাধিক জেলায় অবস্থিত আমাদের শাখাগুলোতে একই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। যদিও এই মডেল স্থাপনে আমরা সময় খুব বেশি পাইনি, মাত্র পাঁচ বছর, যার মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারী, বন্যা, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর প্রোপাগান্ডাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের উপর দিয়ে গেছে। তারপরও আমরা প্রমাণ করেছি, আদর্শ দ্বারা যদি মানুষের আত্মার উন্নয়ন ঘটানো যায়, চেতনার পরিবর্তন সাধন করা যায় তবে এ ব্যবস্থায় নিশ্চিতভাবেই সমাজের সব সমস্যার নিরসন করা সম্ভব।

তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দুশো কোটি। বিশ্বের ৫৬ টি দেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দেশগুলোসহ সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মসজিদে প্রতিদিন কোটি কোটি মুসল্লি নামাজ পড়ছে, লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসায় কোর'আন তেলাওয়াত ও হেফজ করা হচ্ছে, রমজান আসলে প্রায় সমগ্র মুসলমান জনগোষ্ঠী রোজা পালন করছে, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হজ ও ইজতেমা করছে, ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে, পীরের দরবারে উরশ ও জিকির আজকার হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এই মুসলিম জনগোষ্ঠী সকল জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, পরাজিত কেন?

এই প্রশ্নের বহুরকম উত্তর প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা হেযবুত তওহীদ বলছি, এর কারণ সমগ্র মুসলিম জাতি ইসলামের ভিত্তি 'তওহীদ' থেকে সরে গেছে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ হাজারো রকম আমলের পূর্বশর্ত যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমান, সেই ঈমান থেকে তারা সরে গেছে। কলেমা তওহীদের অঙ্গীকারে তারা সদা-সর্বদা ঘোষণা দিচ্ছে যে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা, বিধানদাতা (ইলাহ) নেই। কিন্তু বাস্তবে তারা আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ কোর'আনের হুকুম প্রত্যাখ্যান করে মানুষের তৈরি হুকুম মানছে, এক কথায় আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে তারা ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই কাজ করে তারা কলেমা তওহীদের অঙ্গীকার থেকে বের হয়ে গেছে, ইসলাম থেকেও বের হয়ে গেছে। এই অবস্থায় তাদের নামাজ রোজার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। কারণ নামাজ রোজাসহ যে কোনো আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান তথা কলেমা তওহীদ। যারা এ কলেমাতেই নেই তাদের নামাজ রোজা সবই অর্থহীন। এই তওহীদের ঘোষণা হচ্ছে সমগ্র মুসলিম জাতির ঐক্যসূত্র। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তির আনুগত্য ও দাসত্ব না করার এই ঘোষণাই তাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিল। সুতরাং মানুষের হুকুম বিধান জীবনে কার্যকর করে আল্লাহকে যতই উপাসনা করা হোক না কেন, তা এ জাতির দুর্দশা দূর করতে কোনো কাজেই আসবে না। আখেরি নবীসহ সকল নবী-রসুল মানুষকে এই তওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন, আমরাও শেষ নবীর উম্মত হিসাবে মানবজাতিকে আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য। তওহীদের এই ডাকে যদি কারো হৃদয়তন্ত্রীতে হেদায়াতের ঝংকার ওঠে আজই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর তওহীদের রজ্জু ধারণ করার তওফিক দান করুন। আমিন।